ইউনিট ৮

সনাতন সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান সমূহ

ভূমিকা

সমাজ সৃষ্টির গোড়া থেকে অপরিবর্তনীয় ধারায় বা পদ্ধতিতে সমাজের অসুবিধাগ্রস্থ মানুষের স্বার্থে স্বেচ্ছা প্রণোদিতভাবে যে বিভিন্ন কল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে তাই-ই সনাতন সমাজকল্যাণ বা ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণ নামে পরিচিত।

ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণের ক্ষেত্রে ধর্মের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। প্রত্যেক ধর্মেই নিরন্নকে অন্ন দান, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দান, আশ্রয়হীনকে আশ্রয় দান, বিপদগ্রস্থকে সাহায্য দান এবং অভয় দানের কথা বলা হয়েছে। এছাড়াও রয়েছে মানবতাবোধ; এই গুণটি মানুষের সহজাত। মানব প্রেমই মানুষের সহযোগিতা অনুকম্পা, সৌহার্দ্য ও সমতির সৃষ্টি করেছে। তাছাড়া ব্যাপক গণপরিচিতি, সামাজিক স্বীকৃতি এবং সামাজিক নেতৃত্ব লাভের আশাও সনাতন সমাজকল্যাণ ক্ষেত্রে গুরুত্ব পূর্ণ প্রভাব ফেলেছে।

তাই সমাজকল্যাণ ধারা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় দানশীলতা, বদান্যতা, অনুকম্পা, সাহায্য ইত্যাদিই ছিল ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণের মূল ভিত্তি। এসব দান বা সাহায্য কখনো ব্যক্তি পর্যায়ে, কখনোবা প্রতিষ্ঠানিকভাবে পরিচালিত হত। অতএব বলা যায়, মানবতাবোধ, দানশীলতা ও ধর্মীয় নীতি মুল্যবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে সমাজের ধনাঢ্য ও সম্পদশালী বক্তিগণ সমাজের অসহায় দুঃস্থ ও আর্ত-মানবতার সেবায় যে সকল বিধি-বিধান, প্রথা-প্রতিষ্ঠান, রীতি-নীতি ও পদ্ধতির মাধ্যমে সমাজের সেবা করাহয় সেগুলোকেই সনাতন সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিত। যেমন- দানশীলতা, যাকাত, ওয়াকফ, এতিমখানা ও দেবোত্তর ইত্যাদি। আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশে সামাজিক উন্নয়ন ও পুনর্গঠনে সনাতন সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীতা ও গুরুত্ব অপরিসীম।

এই ইউনিটের পাঠগুলো হলো

পাঠ-৮.১ ঃ সনাতন সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে দানশীলতা
পাঠ-৮.২ ঃ সনাতন সমজাকল্যাণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাকাত
পাঠ-৮.৩ ঃ সনাতন সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে সদ্‌কা
পাঠ-৮.৪ ঃ সনাতন সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে ওয়াক্‌ফ
পাঠ-৮.৫ ঃ সনাতন সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেবোত্তর প্রথা
পাঠ-৮.৬ ঃ সনাতন সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে বায়তুলমাল
পাঠ-৮.৭ ঃ সনাতন সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে ধর্মগোলা
পাঠ-৮.৮ ঃ সনাতন সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে সরাইখানা
পাঠ-৮.৯ ঃ সনাতন সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে লঙ্গরখানা
পাঠ-৮.১০ ঃ সনাতন সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে এতিমখানা।

পাঠ-৮.১ ঃ সনাতন সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে দানশীলতা

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়ে আপনি –

- ☞ ৮.১ঃ১ দানশীলতার ধারণা দিতে পারবেন
- ☞ ৮.১ঃ২ দানশীলতার ভূমিকা বা বর্ণনা করতে পারবেন
- ☞ ৮.১ঃ৩ দানশীলতার বৈশিষ্ট্য / ত্রুটি কি কি চিহ্নিত করতে পারবেন।

৮.১ঃ১ দানশীলতা

দানশীলতা সনাতন সমাজকল্যাণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। সুপ্রাচীন কাল থেকে এটি প্রচলিত হয়ে আসছে এবং বিভিন্ন ধর্মে এটিকে গুরুত্ব সহকারে উপস্থাপনা করা হয়েছে"।

দানশীলতার ইংরেজী Charit প্রতিশব্দ ল্যাটিন Charitas থেকে উদ্ভুত ; যার অর্থ মানব প্রেম। মানব কল্যাণে বিনা শর্ত ও স্বার্থে কিছু ত্যাগ বা দান করাকে দানশীলতা বলে। দানশীলতা করুণা বা ভিক্ষা নয় বরং অন্যের কল্যাণে দাতা নিজেই উদ্বুদ্ধ হয়ে শর্তহীন ও নিঃস্বার্থভাবে সাহায্য করার মাধ্যমে প্রকাশিত মানব প্রেমই হচ্ছে দানশীলতা। ইসলাম ধর্মে খয়রাত, সদ্‌কা; বৌদ্ধ ধর্মে বদান্যতা, খ্রিস্ট ধর্মে চ্যারিটি; হিন্দু ধর্মে দান প্রভৃতি দানশীলতার উদাহরণ।

দানশীলতা সম্পূর্ণভাবে ইচ্ছাধীন একটি ব্যাপার। ধর্মীয় অনুপ্রেরণা ও মানবতাবোধ দানশীলতার মুল ভিত্তি। ব্যক্তির সামর্থ ও ইচ্ছার উপর সাধারণত দানশীলতা নির্ভরশীল। অভাব-অনটন গ্রস্থ, আর্ত-পীড়িত, দুঃস্থ ও অসহায় মানুষের কল্যাণ করা দানশীলতার মুল লক্ষ্য। বিভিন্ন প্রাকৃতিক দূর্যোগে দানশীলতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দানশীলতার মাধ্যমে মানুষ ইহলৌকিক প্রশান্তি এবং পারলৌকিক মুক্তি লাভের বাসনা পূর্ণ করে। খ্রিস্টান ধর্মে চ্যারিটি ইসলাম ধর্মে খয়রাত, সদগাহ এবং হিন্দু ধর্মে 'দান' ইত্যাদি দানশীলতার উদাহরণ।

৮.১ঃ২ দানশীলতার গুরুত্ব

পারলৌকিক মুক্তি এবং দুস্থ ও অসহায় শ্রেণির দুর্দশা লাঘবের লক্ষ্যে দানশীলতা পরিচালিত হয়। দানশীলতা বিভিন্ন সময়ে সমস্যাগ্রস্থ ব্যক্তি এবং দুস্থ-আর্তপীড়িত জনগণকে সাহায্য করে আসছে। ইসলামে দানশীলতাকে ইহকালীন মঙ্গল ও পারলৌকিক মুক্তির উপায়রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। দানশীলতার অনুপ্রেরণায় ইংল্যান্ডে ও আমেরিকায় 'দান সংগঠন আন্দোলন' (Charity Organization Movement) গড়ে ওঠে এবং দান সংগঠন আন্দোলন হতে 'দান সংগঠন সমিতি' (Charity Organization Society – COS) গড়ে ওঠে। এই দান সংগঠন সমিতি সমাজকল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আধুনিক সমাজকল্যাণের বিকাশে দানশীলতা অনবদান রাখতে সক্ষম হয়।

৮.১ঃ৩ দানশীলতার ত্রুটি/ বৈশিষ্ট্য/সীমাবদ্ধতাঃ

দানশীলতা সমাজের সৃষ্টি লগ্ন থেকে অসহায় মানুষের কল্যাণ করলেও আধুনিক সমাজকল্যাণের দৃষ্টিতে দানশীলতার অনেক ত্রুটিও রয়েছে যা দানশীলতার বৈশিষ্ট্য নামেও পরিচিত। নিচে এগুলো চিহ্নিত করা হল--

১. দানশীলতা অপরিকল্পিত, অসংগঠতি ও বিচ্ছিন্ন।
২. মানুষের অনুভূত চাহিদার প্রতি তেমন গুরুত্ব দেয়া হয় না।
৩. এটা দাতার ইচ্ছা ও অনিচ্ছার উপর নির্ভরশীল।
৪. এটা সমস্যার স্থায়ী সমাধান দিতে পারে না।
৫. দানশীলতা অধিকাংশ ক্ষেত্রে বস্তুগত সহায়তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে।
৬. ইহা মানুষকে শ্রমবিমুখ করে তোলে।
৭. দানশীলতা মানুষকে পরনির্ভরশীল মানসিকতা গড়ে তুলতে সাহায্য করে।
৮. ইহা মানুষের মানবিক মর্যাদা ক্ষুন্ন করে এবং হীনমন্যতার সৃষ্টি করে।

উপসংহারে বলা যায় যে, দানশীলতার উপর্যুক্ত ত্রুটি থাকা সত্ত্বে ও স্মরণাতীত কাল থেকে আর্ত-মানবতার সেবায় প্রশংসনীয় অবদান রাখছে।

সার-সংক্ষেপ

দানশীলতা সনাতন সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অন্যতম যা পরবর্তীতে দান সংগঠন আন্দোলনে অনুপ্রেরণা জোগায়। নিঃস্বার্থ ও নিঃশর্তভাবে অপরের কল্যাণের জন্য স্বত্বঃত্যাগ করে কিছু প্রদান করার প্রথাই দানশীলতা। ধর্মীয় অনুশাসন ও মানব প্রেমই এর মুল ভিত্তি। এর লক্ষ্যই হচ্ছে আর্ত-পীড়িত, দুঃস্থ, অসহায় ও অভাব-অনটন গ্রস্থমানুষের কল্যাণে সাহায্য করা। আধুনিক সমাজকল্যাণের দৃষ্টিতে দানশীলতা ত্রুটিপূর্ণ হলেও সমাজকল্যাণে এর গুরুত্ব অপরিসীম।

পাঠোত্তর মুল্যায়ন – ১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। দানশীলতার লক্ষ্য কী?

ক. ভিক্ষুকদের কল্যাণ করা
খ. প্রতিবন্ধীদের কল্যাণ করা
গ. দরিদ্রদের কল্যাণ করা
ঘ. সকলের কল্যাণ করা।

২। দানশীলতার ভিত্তি কী?

ক. মানবতাবোধ ও ধর্মী অনুপ্রেরণা
খ. সেবামুলক মনোভাব
গ. অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী
ঘ. সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী।

পাঠ-৮.২ ঃ সনাতন সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাকাত

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়ে আপনি ----

- ☞ ৮.২ঃ১ যাকাত কি বলতে পারবেন
- ☞ ৮.২ঃ২ যাকাতের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে পারবেন
- ☞ ৮.২ঃ৩ যাকাত আদায়ের খাত গুলো চিহ্নিত করতে পারবেন
- ☞ ৮.২ঃ৪ যাকাত দানের খাত গুলো চিহ্নিত করতে পারবেন
- ☞ ৮.২ঃ৫ সমাজকল্যাণে যাকাতের গুরুত্ব দেখাতে পারবেন
- ☞ ৮.২ঃ৬ বাংলাদেশে যাকাতের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।

৮.২ঃ১ যাকাত

যাকাত ইসলাম ধর্মের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ ও কল্যাণমুলক প্রতিষ্ঠান। ইসলামি অর্থ ব্যবস্থায় যাকাত বুনিয়াদ স্বরূপ বা মেরুদন্ড বিশেষ। সমাজ ও রাষ্ট্রের উপর এর প্রভাব অপরিসীম। জাতীয় জীবনের এক বিরাট অংশ যাকাতের উপর নির্ভরশীল। যাকাত ব্যবস্থা আদিকাল হতেই মানব জাতিকে প্রকট ও জটিল আর্থ-সামাজিক সমস্যার সমাধান দিয়ে আসছে। মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামীন এ শাশ্বত বিধানকে মানুষের নৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক সমাধান বলে ঘোষণা করেছেন। যাকাতের গুরুত্ব অতীব ব্যাপক ও সুদূর প্রসারী। এটি একাধারে ইবাদ (মালী) এবং অন্যদিকে ইসলামি অর্থনৈতিক মুল চাবিকাঠি।

যাকাত আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ 'প্রবৃদ্ধি' ও 'পবিত্রতা' বা 'পরিশোধন-পরিচ্ছন্নতা-সুসংবদ্ধতা। লিসানুল আরব গ্রন্থে বলা হয়েছে, যাকাত শব্দের মুল আভিধানিক অর্থঃ পবিত্রতা, ক্রমবৃদ্ধি, আধিক্য ও প্রশংসা। এসব অর্থ পবিত্র কুরআনও হাদিসে উদ্ধৃত হয়েছে।

যাকাত অর্থ প্রবৃদ্ধি। যাকাত আদায় করলে অর্থ-সম্পদ ব্যক্তি বিশেষের হাতে কুক্ষিগত না থেকে বরং সমাজের বহু দরিদ্রদের হাতে সম্প্রসারিত হয় এবং এর সাহায্যে বহু অসহায় ও বেকার লোকের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধিত হয়। এর মাত্রা ও পরিমাণ ক্রমান্বয় বৃদ্দি পায়। তাই যাকাত অর্থ প্রবৃদ্ধি।

যাকাতের অপর অর্থ 'পবিত্রতা'। সম্পদের প্রতি লিপ্সা, আকর্ষণ ও সঞ্চয়ের আকাঙ্খা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। নৈতিক ক্ষেত্রে যাকাত মানুষের মধ্যে হতে কৃপণতা, কপটতা, অপবিত্রতা ও লোভ-লালসা হতে মুক্ত করে পবিত্র রাখে। এই পবিত্রতা শুধু মাল-সম্পত্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না বরং যাকাত প্রদানকারীর মন-মানসিকতা ও ধ্যান-ধারণা পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়।

ইসলামী অর্থনীতির পরিভাষায় ঋণ ও যাবতীয় প্রয়োজন নির্বাহের পর নির্দিষ্ট পরিমাণ (নিসাব পরিমাণ) কোন অর্থ কারো নিকট পূর্ণ এক বছর সঞ্চিত থাকলে তার নির্দিষ্ট অংশ আল্লাহর নির্দেশিত পথে বাধ্যতামুলক ব্যয় করার বিধানই যাকাত। অন্যভাবে বলা যায় ইসলামী শরীয়তের বিধান অনুযায়ী কোন মুসলমানের সম্পদ যাবতীয় ব্যয় নির্বাহের পর বার্ষিক নির্দিষ্ট সীমার উর্দ্ধে উদ্ধৃত্ত থাকলে নির্দিষ্ট হারে নির্দিষ্ট শ্রেণীর মধ্যে বাধ্যতামুলক ভাবে বিতরণ করার বিধানই যাকাত। পবিত্র হাদিস অনুযায়ী সঞ্চিত ধন-সম্পদের উপর পূর্ণ এক বছর ঘুড়ে না আসা পর্যন্ত যাকাত দান ফরয হয় না। যাকাত একদিকে ধনীদের জন্য যেমন একটি কর অন্যদিকে যাকাত প্রাপকদের জন্য অধিকার।

ইসলামে যাকাত আদায়ে কঠোর ব্যবস্থার বিধান জারি করা হয়েছে। হাদিস শরীপেও যাকাতের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে ঃ "যাকাত অস্বীকারকারীর জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে শাস্তি অবধারিত। এমনিভাবে সাহাবীগণ ও যাকাত আদায়ে অত্যন্ত কঠোর ছিলেন।" হযরত আবু বকর (রাঃ) বলেছেন, "আল্লাহর কসম, যারা নামাজ ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করে, তাদের বিরুদ্ধে অবশ্যই যুদ্ধ করব।" (কারযাভী ঃ ১৯৮৩)

৮.২ঃ২ ঃ যাকাতের বৈশিষ্ট্য

১। যাকাত দান প্রথা ইসলামের একটি ফরজ বিধান।
২। যাকাত প্রদানের বিধান স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে অপরিবর্তনীয় ও সার্বজনীন।
৩। যাকাত কোন ক্রমেই দান নয়। ব্যক্তির ইচ্ছা অনিচ্ছার সাথে ইহার কোন সম্পর্ক নেই।
৪। ধনাঢ্য মানুষের জন্য যাকাত বাধ্যতামুলক।
৫। যাকাত নির্ধারিত আটটি খাতের বাহিরে ব্যয় করা যায় না।
৬। নির্ধারিত আটটি শ্রেণীর জন্য যাকাতের অর্থ অধিকার হিসেবে স্বীকৃত।
৭। যাকাত ধনী দরিদ্র্যের ব্যবধান কিছুটা হলেও হ্রাস করে।
৮। যাকাত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীর একটি বলিষ্ট পদক্ষেপ।

৮.২.৩ ঃ যাকাত আদায়ের খাত গুলো নিম্নে উল্লেখ করা হল ঃ

১। **স্বর্ণ ঃ** কারো নিকট সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ থাকলে তার উপর শতকরা আড়াইভাগ স্বর্ণ বা সমপরিমাণ মুল্য যাকাত হিসেবে দান করা বাধ্যতামুলক।

২। **রৌপ্য ঃ** যে কোন ভাবে ৫২$\frac{১}{২}$ তোলা রৌপ্যে থাকলে তার শতকরা ২$\frac{১}{২}$ ভাগ বা সমপরিমাণ মুল্য যাকাত হিসেবে দান করতে হবে।

৩। **স্বর্ণ ও রৌপ্য ঃ** স্বর্ণ ও রৌপ্য মিলিত ভাবে ৫২$\frac{১}{২}$ তোলা রৌপ্যের মুল্যের সমপরিমাণ হলে শতকরা আড়াই ভাগ হারে যাকাত দান করা বাধ্যতামুলক।

৪। **নগদ অর্থ ঃ** বৎসরান্তে যাবতীয় খরচ বাদে যে পরিমাণ নগদ অর্থ ব্যাংক, বীমা, প্রভিডেন্ট ফান্ড, বৈদেশিক মুদ্রা বা জমা অর্থের উপর শতকরা আড়াই টাকা হারে যাকাত দান করা বাধ্যতামুলক।

৫। **উৎপন্ন ফসল ঃ** সেচবিহীন উৎপন্ন ফসলের $\frac{১}{১০}$ ভাগ এবং যান্ত্রিক সেচের ফলে উৎপন্ন ফসলের $\frac{১}{২০}$ ভাগ যাকাত দান ফরজ।

৬। **গৃহপালিত পশু ঃ** লাভজনক উদ্দেশ্যে পশুপালন করলে পশুর সংখ্যার উপর নির্দ্দিষ্ট হারে যাকাত দান করতে হয়।
ক) প্রতি ৩০টি গরু বা মহিষের জন্য একটি এক বছরের অধিক বয়েসের বাছুর যাকাত দান ফরজ।
খ) প্রতি ৪০ টি ছাগল, ভেড়া বা দুম্বার জন্য ১ বছরের অধিক বয়েসের ১টি বাছুর যাকাত দান ফরজ।

৭। **ব্যবসায়িক পণ্য ঃ** ব্যবসায়িক পণ্য বা মুলধনের পরিমাণ ৫২$\frac{১}{২}$ তোলা রৌপ্য বা ৭$\frac{১}{২}$ তোলা স্বর্ণের মুল্যের সমান হলে ২$\frac{১}{২}$% টাকা হারে যাকাত দান করা বাধ্যতামুলক।

৮। খনিজ দ্রব্য যে কোন ভূমিতে খনিজ দ্রব্য, গুপ্ত ধন বা অনুরূপ সম্পদ পাওয়া গেলে তা ব্যবহারের পূর্বে $\frac{১}{৫}$ ভাগ হিসেবে যাকাত দান ফরজ।

৮.২.৪ ঃ যাকাত ব্যয়ের খাত

পবিত্র কোরআন পাকের 'সূরা তওবায়' আট শ্রেণীর মানুষের জন্য যাকাতের অর্থ বিতরণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

১। দরিদ্র ব্যক্তি;
২। মিসকিন (নিঃস্ব);
৩। মুক্তিকামী ক্রীতদাস;
৪। বিপদগ্রস্থ পথিক বা মুছাফির;
৫। আল্লাহর পথে জিহাদকারী মুজাহিদ;
৬। ঋণ পরিশোধে অক্ষম ঋণগ্রস্থ ব্যক্তি;
৭। নও বা নব্য মুসলিম; এবং
৮। যাকাত সংগ্রহ ও বিতরণকারী ব্যক্তি।

৮.২ঃ৫ সমাজকল্যাণে যাকাতের গুরুত্ব

যাকাত পৃথিবীর প্রথম সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা। যাকাতের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও নৈতিক গুরুত্ব ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী। যাকাত মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক, ভ্রাতৃত্ববোধ, সহানুভূতি, সহনশীলতা, মিতব্যয়িতা, সমাজের প্রতি কর্তব্য পালন সম্পর্কে সচেতনতা ইত্যাদি গুনাবলী অর্জন করে। যাকাতের মাধ্যমে সমাজে শৃঙ্খলা, সংহতি ও সমন্বয় বজায় থাকে।
সমাজকল্যাণে যাকাতের বহুমুখী গুরুত্বের বিশেষ বিশেষ দিকগুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো।

১. **আর্ত-মানবতার সেবা ঃ** দুঃস্থ, অসহায় ও আর্ত-মানবতার কল্যাণ সাধন সমাজকল্যাণের একটি অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। যাকাত সমাজকল্যাণের এই লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করে থাকে।

২. **সম্পদের সুষম বন্টন ঃ** যাকাত অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রাপ্ত সম্পদ ও সুযোগ সুবিধার সুষম বন্টনের ব্যবস্থা করে। ফলে সম্পদ মুষ্টিমেয় লোকের নিকট কুক্ষিগত হতে পারে না।

৩. **শ্রেণী বৈষম্য দুরীকরণ ঃ** যাকাত সমাজে বিত্তশালী ও বিত্তহীনদের মধ্যে বৈষম্য দূরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৪. **বাঞ্ছিত আর্থ-সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি ঃ** পরিকল্পিত উপায়ে যাকাত সংগ্রহ ও বিতরণ বাঞ্ছিত আর্থ-সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করে।

৫. **জনগণের সঠিক ভূমিকা নির্ধারণ ও পালনে সাহায্য করাঃ** যাকাত সমাজের দরিদ্র মুসলমানদের কল্যাণে সম্পদশালী মুসলমানদের কি ভুমিকা ও দায়িত্ব রয়েছে তা শুধু নির্ধারণই করে না বরং তা পালনে তাদেরকে বাধ্য করে।

৬. **নৈতিক উন্নতি বিধান ঃ** যাকাত মানুষের উন্নত নৈতিক চরিত্র গঠনে সাহায্য করে যা সমাজকল্যাণে খুবই সহায়ক।

৭. **সৌহার্দমুলক সমাজ গঠন ঃ** যাকাত ধনী, দরিদ্র্যের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি করে পারস্পরিক নির্ভরশীল ও সৌহার্দমুলক সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করে।

৮. **সামগ্রিক উন্নয়নঃ** যাকাত ব্যবস্থায় অর্থের বন্টন ও ব্যয়ের ফলে অর্থের গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়। ফলে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটে এবং সমাজের সামগ্রিক উন্নয়ন সাধিত হয়।

৯. **সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য বোধ ঃ** যাকাত মানুষকে স্বার্থপরতা ও অর্থ লিপ্সা দূর করে সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য বোধ সৃষ্টি করে।

১০. **দারিদ্র্য দূরীকরণ ঃ** ইসলামী বিধান অনুযায়ী যাকাত সংগ্রহ ও বিতরণ ব্যবস্থা দরিদ্রতা ও ভিক্ষাবৃত্তি দূর করা সম্ভব।

পরিশেষে বলা যায় যে, শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা, সামাজিক সাম্য ও ইনসাফ কায়েমের মাধ্যমে আর্থ- সামাজিক উন্নয়নে যাকাতের ভূমিকা ও গুরুত্ব অপরিসীম।

৮.২.৬ ঃ বাংলাদেশে যাকাতের গুরুত্ব

যাকাত হচ্ছে উল্লেখযোগ্য একটি সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা। বাংলাদেশ বিশ্বের দরিদ্র দেশ সমুহের মধ্যে অন্যতম মুসলিম প্রধানদেশ। এদেশে ব্যাপক সামাজিক নিরাপত্তা মুলক কোন কর্মসূচী নেই। দারিদ্র্য, বেকারত্ব, ভিক্ষাবৃত্তি নিরক্ষরতা, স্বাস্থ্যহীনতা, বার্ধক্য, ইত্যাদি আর ও অনেক সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা এখানে বিদ্যমান। এ সকল সমস্যা সমাধানে যাকাত কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারে। আমাদের দেশের বিপুল পরিমাণ ধর্মপ্রাণ লোক প্রতি বৎসর প্রচুর যাকাত প্রদান করেন। ব্যক্তিগত ভাবে, বিচ্ছিন্ন ভাবে এই যাকাত প্রদান করা হয়। যা যাকাতের নিয়ম ও উদ্দেশ্যের পরিপন্থী কাজ। ফলে সমাজের সমস্যার স্থায়ী সমাধান ও কল্যাণ লাভ সম্ভব হচ্ছে না। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সুসংগঠিত ও সুপরিকল্পিত ভাবে অর্থাৎ ইসলামী বিধান অনুযায়ী যদি যাকাত সংগৃহীত ও বিভিন্ন উৎপাদনমুখী প্রকল্প খাতে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা হয় তাহলে বাংলাদেশে দারিদ্র্য, বেকারত্ব, ভিক্ষাবৃত্তি, স্বাস্থাহীনতা, বার্ধক্য, বৈধব্য ও এতিম ইত্যাদি সমস্যা খোঁজেই পাওয়া যাবে না। যাকাত মুসলমানদের ইহকালীন সুখ, শান্তি ও কল্যাণ এবং পরকালীন মুক্তির পথ দেখায়। এক কথায় বাংলাদেশের সমাজ পরিবর্তনে যাকাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
১৯৮২ সালে বাংলাদেশ সরকার এক অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে 'জাতীয় জাকাত ফান্ড' গঠন করেন। এর ৩/১ ধারা মোতাবেক 'জাতীয় যাকাত বোর্ড' গঠিত হয়েছে। মুসলমানরা স্বেচ্ছায় এ ফান্ডে যাকাত প্রদান করে থাকে। সরকারি পর্যায়ে

উৎপাদিত শস্য, স্বর্ণ, রৌপ্য, অলংকার, নগদ ও সঞ্চিত টাকা, ব্যবসায়িক পণ্য ও মুলধন প্রভৃতির মাধ্যমে যাকাত আদায় ও সুষ্ঠু ব্যবস্থা গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। এজন্য যথাযথ পরিকল্পনা ও প্রাতিষ্ঠানিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলসমূহ ও ইসলামি প্রতিষ্ঠানসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

উপর্যুক্ত আলোচানার প্রেক্ষিতে বলা যায়, সমাজকল্যাণ ও সমাজব্যবস্থায় যাকাতের গুরুত্ব ও ভূমিকা অনন্য ও অপরিসীম। মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, নৈতিক, রাষ্ট্রিক প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রে যাবতীয় সমস্যার একমাত্র ও চিরন্তন সমাধান হচ্ছে যাকাত ব্যবস্থার প্রর্বতন। ইসলামী সমাজের ভিত্তি ও প্রাণকেন্দ্র হচ্ছে নিয়ন্ত্রিত ও পরিশোধিত ব্যক্তি মালিকানা ও যাকাত ব্যবস্থা। যা নিঃস্ব, অসহায়, দুস্থ ও দরিদ্র আর্তমানবতাকে স্বল্প সময়ে অর্থনৈতিক বঞ্চনা ও সামাজিক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিতে সক্ষম। The Gurdian পত্রিকায় প্রকাশিত দু'জন অমুসলিম অধ্যাপকের দৃষ্টিভঙ্গি এ প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য; তারা বলেন "The muslim system seems to us have a great merit. The western world study it and perhaps adopt it in whole or in part." (রহিমঃ১৯৮৪)

সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, যাকাত প্রথা আধুনিক গোলক ধাঁধার যুগে সর্বপ্রকার সামাজিক অসমতা দূর করে একটি কল্যাণকর, সুখী, সমৃদ্ধশালী ও শান্তিপূর্ণ সমাজের ভিত্তি স্থাপনে সক্ষম। অতএব, আমাদের উচিত আল্লাহর নির্দেশিত পন্থায় যাকাত আদায়ের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক মুক্তি ও সমৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা।

সার-সংক্ষেপ

যাকাত সনাতন সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান গুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি বিধান বা প্রথা। যাকাত ধনাঢ্য মুসলমানদের জন্য ফরজ ইবাদত। প্রয়োজন নির্বাহের পর নির্দিষ্ট পরিমাণ (নিসাব পরিমান) অর্থ কারো নিকট পূর্ণ এক বছর যাবত জমা থাকলে তার নির্দিষ্ট অংশ আল্লাহর নির্দেশিত পথে বাধ্যতামুলক ভাবে ব্যয় করার বিধানই যাকাত। পাঁচ ধরনের সম্পদ যেমন ১) সোনা, রূপা ও নগদ অর্থ (২) গৃহপীলত পশু (৩) উৎপন্ন ফসল (৪) ব্যবসায়িক পণ্য (৫) খনিজ দব্যের উপর নির্ধারিত হারে যাকাত প্রদান করা হয়। যাকাত বিতরণের আটটি খাত হলো (১) দরিদ্র ব্যক্তি (২) মিসকিন(নিঃস্ব শ্রেণী) (৩) মুক্তিকামী ক্রীতদাস (৪) বিপদ গ্রস্থ পথিক (মুছাফির) (৫) আল্লাহর পথে জিহাদকারী (৬) ঋণগ্রস্থ (৭) যাকাত সংগ্রহকারী (৮) নও-মুসলিম অর্থাৎ নব্য ইসলাম গ্রহণকারী। যাকাত একটি বৈজ্ঞানিক সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা। সুপরিকল্পিত ও সুসংগঠিত ভাবে যাকাত সংগ্রহ এবং সদ্ব্যবহার হলে মুসলিম অধ্যুষিত রাষ্ট্রে দরিদ্র, বেকার, ভিক্ষুক ও এতিমদের সমস্যা থাকবে না। অর্থাৎ সমস্যামুক্ত সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি হবে এবং ফলে মানুষ ইহকালীন সুখ-শান্তি ও কল্যাণ লাভ করবে এবং পরকালীন মুক্তির পথ উন্মুক্ত হবে। তাই বলা যায় সমাজকল্যাণে যাকাতের গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশের মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, নৈতিক ও রাষ্ট্রীয় প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রে যাবতীয় সমস্যার একমাত্র ও চিরন্তন সমাধানে যাকাতের ভূমিকা প্রনিধানযোগ্য।

পাঠোত্তর মুল্যায়ন – ২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। যাকাত শব্দের অর্থ কি?

ক) আত্মশুদ্ধি খ) পবিত্রতা গ) ধন ভান্ডার ঘ) অর্থদান।

২। সূরা তওবায় কয় শ্রেণীর মানুষকে যাকাত দানের কথা বলা হয়েছে?

ক) ৭ শ্রেণীর খ) ৮ শ্রেণীর গ) ৯ শ্রেণীর ঘ) ১০ শ্রেণীর।

৩। যাকাত দেওয়া হয় কি হিসেবে?

ক) ওয়াজিব হিসেবে খ) ফরজ হিসেবে গ) সুন্নত হিসেবে ঘ) নফল হিসেবে।

পাঠ-৮.৩ ঃ সদ্‌কা

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়ে আপনি---

☞ ৮.৩ঃ১ সদকা কি বলতে পারবেন

☞ ৮.৩ঃ২ সমাজকল্যাণে সদকার গুরুত্ব দেখাতে পারবেন।

৮.৩ঃ১ সদ্‌কা

সাদাকাত শব্দটি বহুবচন। এর এক বচন হল সাদ্‌কা। অর্থাৎ আরবী অভিধানে আল্লাহর ওয়াস্তে সম্পদের যে অংশ ব্যয় করা হয় তাকে সদকা বলে। ইমাম রাগেব (রঃ) বলেন যে, "কোন দানকে সদ্‌কা বলে।" দুঃস্থ, অসহায় ও আর্ত-মানবতার সেবাই এর মুল লক্ষ্য। পার্থিব জীবনের পাপ মোচন, বিপদ আপদ থেকে মুক্তি লাভ, সংসার জীবনে উন্নতি এবং পরকালে শান্তি লাভের উদ্দেশ্যে কোন কিছু দান করাকে সদ্‌কা বলা হয়। সদকার মুলদর্শন হচ্ছে সমাজ ও মানুষের কল্যাণ সাধনের মাধ্যমে স্রষ্টাকে তুষ্ট করা।

সাধারণ দানের সাথে সদ্‌কার মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। কারণ দান বা খয়রাত উদ্দেশ্য বিহীনভাবে ও করা যেতে পারে। সদ্‌কা সাধারণত উদ্দেশ্য মুলক দান। যেসব দান স্থায়ীভাবে বিশেষ করে ধর্মীয় বা জনকল্যাণ মুলক প্রতিষ্ঠানে করা হয় সেগুলোকে সদকায়ে জারিয়া বলে। এছাড়া মানুষকে জ্ঞান দান, সৎ পরামর্শ দান, ভাল কাজে উৎসাহিত করা, অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখা ও সদ্ব্যবহার ইত্যাদি ও সদকায়ে জারিয়ার মধ্যে গণ্য হয়ে থাকে।

উদ্দেশ্যের দিক থেকে সদকা ও যাকাতের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। উভয়ের লক্ষ্য হচ্ছে সৃষ্টির সেবার মাধ্যমে স্রষ্টার সন্তুষ্টি অর্জন করা। যাকাত সম্পদ শালীদের জন্য বাধ্যতামুলক। কিন্তু সদকা কারো জন্য বাধ্যতামুলক নয়। মুসলমানগন অসুখ-বিসুখ, বিপদ-আপদ দূরীকরণ, আশা-আকাংখা পূরণ, আত্মার মাগফেরাত তথা মুক্তির জন্য সদ্‌কা দিয়ে থাকেন।

৮.৩ঃ২ সমাজকল্যাণে সদ্‌কার গুরুত্ব

সমাজকল্যাণে সদ্‌কার ব্যাপক গুরুত্ব রয়েছে। সমাজের দুঃস্থ অসহায় ও দরিদ্রদের প্রতি সম্পদশালীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সদকার গুরুত্ব অপরিসীম। নিম্নে এসম্পর্কে আলাচনা করা হলো

১. সদ্‌কা দান ব্যক্তির ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। এখানে মানুষ স্রষ্টার সন্তোষ্টি অর্জনের জন্য সমাজ ও মানবতার কল্যাণে ব্যক্তি স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে অংশগ্রহণ করে। যে কোন কল্যাণমুলক কাজে জনগণের স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ সমাজকল্যাণ শুধু গুরুত্বই দেয় না বরং অংশ গ্রহণকে উৎসাহিত করে থাকে।

২. প্রায় সকল মুসলমানই সদ্‌কা দানে কমবেশী অংশগ্রহণ করে। সদকায় অংশগ্রহণ কারীদের সংখ্যা অনেক বেশী। কোন কর্মসূচীতে অধিকাংশ মানুষের অংশগ্রহণকে সমাজকল্যাণ অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে থাকে।

৩. সদকা গ্রহণের মাধ্যমে সমাজে দুঃস্থ অসহায় শ্রেণী তাদের মৌল মানবিক চাহিদা পূরণ করে থাকে যা সমাজকল্যাণের লক্ষ্যের সাথে সম্পূর্ণরূপে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

৪. সদকা সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ জাগ্রত করতে যথেষ্ট সহায়ক। এদিক থেকে সদকার গুরুত্ব রয়েছে।

৫. সমাজে অর্থনৈতিক বিপর্যয় ঘটলে শুধুমাত্র যাকাতের অর্থ দিয়ে সে পরিস্থিতি মোকাবেলা অসম্ভব। এ অবস্থায় সদকার ভূমিকা অতুলনীয়।

পরিশেষে বলা যায়, যাকাতের মতো সদকা সংগঠিত ও পরিকল্পিত উপায়ে সংগ্রহ ও বিতরণ করলে সামাজিক কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারবে।

সার-সংক্ষেপ

আরবী অভিধানে আল্লাহর ওয়াস্থে সম্পদের যে অংশ ব্যয় করা হয় তাকে সদকা বলে। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় সদকা দানশীলতারই বিশেষ রূপ। সদকা যাকাতের ন্যায় ফরজ নয় এবং ইসলামী বিধান অনুযায়ী নফল ইবাদত। সৃষ্টির সেবার মাধ্যমে স্রষ্টার নৈকট্য লাভের উপায় হিসেবে মুসলমানগণ দুঃস্থ অসহায় অর্থাৎ আর্ত-মানবতার সেবায় বস্তুগত ও অবস্তুগত ভাবে যা দান করে তাই সদকা। সদকা মানুষের প্রয়োজন পূরণে সহায়তা করে বিধায় সমাজকল্যাণ ক্ষেত্রে এর যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে।

পাঠ-৮.৪ ঃ ওয়াক্‌ফ

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি অধ্যয়ন করে আপনি-----

- ☞ ৮.৪ঃ১ ওয়াক্‌ফ কি বলতে পারবেন
- ☞ ৮.৪ঃ২ ওয়াক্‌ফ কত প্রকার ও কি কি উল্লেখ করতে পারবেন
- ☞ ৮.৪ঃ৩ ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা বলতে পারবেন
- ☞ ৮.৪ঃ৪ সমাজকল্যাণ ক্ষেত্রে ওয়াক্‌ফর গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন
- ☞ ৮.৪ঃ৫ যাকাত ও ওয়াক্‌ফের মধ্যে পার্থক্য দেখাতে পারবেন।

৮.৪ঃ১ ওয়াক্‌ফ

ওয়াক্‌ফ আরবি শব্দ। এর বাংলা প্রতিশব্দ হচ্ছে আটক। ইমাম আবু হানিফা (রঃ) মতে, "ওয়াক্‌ফ শব্দের অর্থ হলো কোন নির্দিষ্ট বস্তুতে ওয়াকিফ অর্থাৎ ওয়াকফকারীর মালিকানা আটক করে তার আয় দরিদ্রদের দান করা বা অন্যকোন সৎ উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা। ইসলামী বিধান অনুযায়ী কোন মুসলমানের সম্পত্তি আংশিক বা সম্পূর্ণ ধর্মীয় ও জনহিতকর কাজে স্থায়ী ভাবে স্বত্বঃত্যাগ করে দান করাকেই ওয়াক্‌ফ বলে ওয়াক্‌ফ ইসলামী আইন দ্বারা স্বীকৃত।

৮.৪ঃ২ ওয়াক্‌ফের শ্রেণী বিভাগ

ব্যবহারিক দৃষ্টিকোন থেকে ওয়াকফ তিন প্রকার

যথা ঃ (১) ওাকফ-ই-খাইরী (খ) ওয়াকফ-ই-আহলী। গ) ওয়াকফ-ই-লিল্লাহ্। নিম্নে এগুলো আলোচনা করা হলো ঃ

ক) **ওয়াকফ-ই-খাইরী ঃ** কোন মুসলমান যখন তার সম্পত্তির অংশ বিশেষ বা সম্পূর্ণ জনকল্যাণ মুলক কাজে দান বা উৎসর্গ করেন তাকে ওয়াকফ-ই-খইরী বলা হয়। এ জাতীয় ওয়াকফ সম্পত্তির মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, এতিমখানা, রাস্তাঘাট ও হাসপাতাল ইত্যাদি জনকল্যাণ মুলক কাজ করা হয়।

খ) **ওয়াকফ-ই-আহলী ঃ** যখন কোন ওয়াকফ কারী তার সম্পত্তি বা সম্পত্তির অংশ বিশেষ তার বংশধর বা আত্মীয়-স্বজনদের কল্যাণে দান করেন তখন তাকে ওয়াকফ-ই-আইলী বলা হয়। যেমন দাদা কর্তৃক এতিম নাতি নাতনীদের জন্য এরূপ ওয়াকফ করা হয়।

গ) **ওয়াকফ-ই-লিল্লাহ্ ঃ** কোন মুসলমান যখন সম্পূর্ণ ধর্মীয় কাজে তার সম্পত্তি উৎসর্গ করেন, তখন তাকে ওয়াকফ-ই-লিল্লাহ বলা হয়। এর মাধ্যমে মসজিদ, মাজার, দরগাহ, ঈদগাহ মাঠ, খানকা ও দরবার শরীফ প্রভৃতি পরিচালনা করা হয়।

বাংলাদেশে এতিম, দুঃস্থ ও অসহায়দের রক্ষণাবেক্ষণ, শিক্ষা এবং চিকিৎসার ক্ষেত্রে অসংখ্য ওয়াকফ প্রতিষ্ঠান কর্মরত রয়েছে। বাংলাদেশে মোট ওয়াকফ স্টেটের সংখ্যা ১৫০, ৫৫৩টি (১৯৮৬ সালের ওয়াকপ প্রমাসকের জরিপ অনুযায়ী)। এসব ওয়াকফের মধ্যে এতিমখানা, হাসপতাল, স্কুল, মাদ্রাসা, মসজিদ ও দরগাহ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

৮.৪ঃ৩ ওয়াকফ সম্পত্তির ব্যবস্থানা

বৃটিশ শাসন আমলে ১৯১৩ সালের ৭মার্চ এদেশে মুসলমান ওয়াকফ আইন প্রবর্তন করা হয়। তৎকালীণ পাকিস্তানে ১৯৬২ সালে ওয়াকফ সম্পত্তি সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য ওয়াকফ অর্ডিন্যন্স জারি করা হয়। ওয়াকফ সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়কে মোতাওয়াল্লী বলা হয়। ওয়াকফ সম্পত্তি বা প্রতিষ্ঠানের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা বা পরিচালনার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনে সরকার হস্ত ক্ষেপ করতে পারে। কেননা ওয়াকফের আইনগত ভিত্তি রয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম মন্ত্রাণালয় ওয়াকফ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

৮.৪ঃ৪ সমাজকল্যাণে ওয়াকফের গুরুত্ব

সনাতন সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে ওয়াকফের ব্যাপক গুরুত্ব ও তাৎপর্য রয়েছে। নিচে এর গুরুত্বের বিভিন্ন দিক আলোচনা করা হলো ঃ

১. ওয়াকফকৃত সম্পত্তির দ্বারা বহু জনকল্যাণ মুলক কার্যাবলী সম্পাদিত হয়। আধুনিক কালে ও বহু এতিম খানায় লিল্লাহ বোর্ডিং, লঙ্গরখানা, দাতব্য হাসপাতাল প্রভৃতি ওয়াকফকৃত সম্পত্তির দ্বারাই পরিচালিত হচ্ছে।

২. ওয়াকফ পরিচালিত বিভিন্ন কর্মসূচী যেমন- স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, দাতব্য চিকিৎসালয় এবং আয় উপার্জনকারী বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান যেগুলো অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও চিত্তবিনোদন ইত্যাদি মৌল মানবিক চাহিদা পূরণে সহায়তা করে থাকে।

৩. ওয়াকফ পরিচালিত বিভিন্ন পদক্ষেপ যেমন- আউলিয়া, দরবেশদের মাজার, লঙ্গরখানা, খানকা, দরবার শরীফ প্রভৃতি মানুষের আধ্যাত্মিক নৈতিক উন্নতি সাধনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৪. ওয়াকফকৃত সম্পত্তির আয় থেকে বিভিন্ন পদক্ষেপ যেমন পুকুর, কূপখনণ, খাল খনণ, রাস্তা, পুল, সাঁকো ইত্যাদির মাধ্যমে জনকল্যাণ ও জনসেবামুলক কাজ সম্পন্ন হয়ে থাকে। এসব আলোচনার মাধ্যেমে বলা যায় যে, সমাজকল্যাণের বিভিন্ন উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনে ওয়াকফ বিভিন্ন পদক্ষেপের মাধ্যেমে সহায়তা করে থাকে। সুতরাং আধুনিক সমাজকল্যাণে ওয়াকফের ব্যাপক গুরুত্ব রয়েছে।

৮.৪ঃ৫ যাকাত ও ওয়াক্‌ফের মধ্যে পার্থক্যঃ

যাকাত ও ওয়াকফ মুসলিম সমাজের দু'টি জনকল্যাণ মুলক প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও এ দু'য়ের মধ্যে কিছু মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। পার্থক্য গুলো নিম্নরূপ :

১. যাকাত হলো ধনী মুসলমান কর্তৃক গরীব দুঃখীদের প্রদয়ে ইসলামী কর। আর ওয়াকফ হল কোন মুসলমান ব্যক্তির সম্পত্তি ধর্মীয় ও জনকল্যাণমুলক কাজে স্থায়ীভাবে উৎসর্গ করার প্রথা।

২. ইসলামী বিধানমতে ধনীদের যাকাত দেয়া ফরজ। অপরদিকে ওয়াকফ বাধ্যতামুলক নয়। ব্যক্তির ইচ্ছা ধীন কাজ।

৩. যাকাতের উপর গরীব দুঃখিদের অধিকার আছ। কিন্তু ওয়াকফের উপর এমন কোন প্রতিষ্ঠিত অধিকার নেই।

৪. যাকাত নির্দিষ্ট কয়েক শ্রেণীর লোক পেয়ে থাকে। আর ওয়াকফ সকলের জন্য উন্মুক্ত।

৫. যাকাতের ন্যূনতম ও নির্ধারিত হার আছে। অন্যদিকে ওয়াকফের কোন ন্যূনতম বা নির্ধারিত হার নেই।

৬. যাকাত দরিদ্র্যের জন্য একটি সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা। আর ওয়াকফ একটি জনকল্যান মুলক প্রতিষ্ঠান।

৭. পরিশেষে বলা যায়, যাকাত ও ওয়াকফের মধ্যে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও সমাজের সামগ্রিক সর্বাঙ্গীণ কল্যাণে উভয়ের ভূমিকা খুবই ব্যাপক।

সার-সংক্ষেপ

ইসলামী সমাজকল্যাণ মুলক প্রতিষ্ঠান হচ্ছে ওয়াকফ। ইসলামী বিধান অনুযায়ী কোন মুসলমান কর্তৃক তার সম্পত্তি বা সম্পত্তির কোন অংশ বিশেষ জনহিতকর বা ধর্মীয় কাজে স্থায়ী ভাবে স্বত্বঃত্যাগ করে দান করার প্রথাই ওয়াকফ। ওয়াকফ ৩ প্রকার যথা ক) ওয়াক-ই-খাইরি খ) ওয়াকফই-ই-আহলি গ) ওয়াকফ-ই-লিল্লাহ।

ক) ওয়াকফ-ই-খাইরি ঃ ইসলামী বিধান অনুযায়ী সম্পত্তি স্বত্বঃত্যাগ করে জনহিতকর কাজে দান করাকে ওয়াকফ-ই-খাইরি বলে।

খ) ওযাকফ-ই-আহ্লি ঃ ইসলামী বিধান মতে সম্পত্তি বংশধর ও আত্মীয় স্বজনের মধ্যে উৎসর্গ করাকে ওয়াকফ-ই-আহ্লি বলে।

গ) ওয়াকফ-ই-লিল্লাহ্ ঃ ইসলামী হুকুম অনুযায়ী সম্পত্তি ধর্মীয় জনকল্যাণকর কাজে স্থায়ী ভবে দান করাকে ওয়াকফ-ই-লিল্লাহ বলে।

ওয়াকফ কৃত সম্পত্তির মাধ্যমে দুঃস্থ, এতিম, অসহায়দের ভরন-পোষণ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, চিকিৎসার ক্ষেত্রে, স্কুল, কলেজ, মক্তব, মাদ্রাসা, মসজিদ, দরগাহ, দরবার শরীফ, এতিমখানা, হাসপাতাল ইত্যাদি ধর্মীয় ও শিক্ষা মুলক কাজ পরিচালিত হচ্ছে। তাই ওয়াকফের গুরুত্ব অপরসীম। যাকাত ও ওয়াকফের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য হলো যাকাত দান ধনাঢ্য ব্যক্তিদের জন্য ফরজ বা বাধ্যতামুলক কিন্তু ওয়াকফ বাধ্যতামুলক কোন দান নয়।

পাঠোত্তর মুল্যায়ন – ৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। কোন মুসলমানের সম্পত্তি ধর্মীয় কাজে ও জনগনের কল্যাণ সাধনের জন্য স্থায়ী ভাবে দান করা কে ইসলামী পরিভাষায় কি বলে?

ক) দেবোত্তর　　খ) ওয়াক্ফ

গ) যাকাত　　ঘ) দানশীলতা।

২। ওয়াক্ফ কত প্রকার ?

ক) দুই প্রকার　　খ) তিন প্রকার

গ) চার প্রকার　　ঘ) পাঁচ প্রকার।

পাঠ- ৮.৫ ঃ দেবোত্তর

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়ে আপনি----

- ☞ ৮.৫ঃ ১ দেবোত্তর কি বলতে পারবেন।
- ☞ ৮.৫ঃ২ দেবোত্তরের শ্রেণী বিভাগ উল্লেখ করতে পারবেন।
- ☞ ৮.৫ঃ৩ দেবোত্তরের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ☞ ৮.৫ঃ৪ দেবোত্তর ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- ☞ ৮.৫ঃ৫ দেবোত্তর ও ওয়াকফের মধ্যে পার্থক্য দেখাতে পারবেন।

৮.৫ঃ১ দেবোত্তর

দেবোত্তর আক্ষরিক অর্থে ঈশ্বরের সম্পত্তি বা দেবতার সম্পত্তিকে নির্দেশ করে। কোন হিন্দু ধর্ম মতে পাপ মোচন ও দেবতার সন্তুষ্টি লাভের জন্য দেবতার নামে স্থায়ীভাবে সম্পত্তি উৎসর্গ করাকে দেবোত্তর বলা হয়। ধর্মীয় শিক্ষামুলক প্রতিষ্ঠান, অনাথ আশ্রম, ধর্মীয় অনুষ্ঠানের ব্যয় নির্বাহ এবং মানব সেবামুলক কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যেই সম্পত্তি দেবোত্তর প্রথায় উৎসর্গ করা হয়।

৮.৫ঃ২ দেবোত্তরের শ্রেণী বিভাগ

দেবোত্তর সাধারণত দু'ধরনের হয়ে থাকে। যেমন-

১. **আংশিক দেবোত্তর ঃ** যখন কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে সাময়িকভাবে সম্পত্তি দেবতার নামে উৎসর্গ করা হয় তখন তাকে আংশিক দেবোত্তর বলে। এধরনের দেবোত্তর সাধারণত ব্যক্তির পরিবার পরিজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। এই দেবোত্তর সম্পত্তি রক্ষার জন্য দেবোত্তরকারী সেবায়েত নিয়োগ করে থাকে।

২. **সার্বিক দেবোত্তর ঃ** ধর্মীয় জনকল্যাণকর কাজে স্থায়ী ভাবে দেবতার নামে সম্পত্তি উৎসর্গ করার প্রথাকে সার্বিক দেবোত্তর বলে। এরূপ সম্পত্তির তত্ত্বাবধানের জন্য সরকার মনোনীত সেবায়েত নিয়োগ করা হয়।

৮.৫ঃ৩ দেবোত্তর প্রথার তাৎপর্য

দেবতাকে সন্তুষ্ট করার মধ্যে দিয়ে পাপ মোচন এবং মৃত্যুর পরে স্বর্গবাসী হওয়ার উপায় হিসেবে মুলতঃ দেবোত্তর প্রথার উদ্ভব। ভারতীয় উপ মহাদেশে তথা বাংলাদেশে দেবোত্তরের মাধ্যমে বহু মন্দির, পূজা মন্ডপ, আশ্রম, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে।

হিন্দু ধর্মের এই প্রথা প্রাচীন কাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকৃতির ধর্মীয় ও সমাজকল্যাণ মুলক কাজে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে যাচ্ছে। বিশেষ করে তীর্থ স্থান সমুহে তীর্থযাত্রীদের থাকা, খাওয়াসহ অন্যান্য প্রয়োজন পূরণে দেবোত্তর সম্পত্তির অবদান ও ভূমিকা অপরিসীম।

৮.৫ঃ৪ দেবোত্তর সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা

দেবোত্তর সম্পত্তি তত্ত্বাবধান রক্ষনাবেক্ষণ ও পরিচালনার জন্য একজন সেবায়েত নিযুক্ত করা হয়। তবে এ সেবায়েত আংশিক দেবোত্তরের ক্ষেত্রে দেবোত্তরকরী কর্তৃক এবং সার্বিক দেবোত্তরের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হয়। সেবায়েতকে সহায়তার জন্য জনগণকে নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হয়। ধর্ম মন্ত্রণালয়ের ওয়াক্ফ প্রশাসকের দায়িত্বের সম্প্রসারণে বাংলাদেশে দেবোত্তর সম্পত্তি তত্ত্বাবধান করা হয়ে থাকে।

৮.৫ঃ৫ ওয়াকফ ও দেবোত্তরের মধ্যে পার্থক্য ঃ

ওয়াকফ ও দেবোত্তর দু'টিই ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান। এ দুয়ের মধ্যে বিরাজমান পার্থক্যগুলো নিম্নরূপ ঃ

১. কোন মুসলমানের সম্পত্তি ধর্মীয় ও জনকল্যাণকর কাজে স্থায়ীভাবে দান করাকে ওয়াকফ বলে। অন্যদিকে হিন্দু বিধান মতে দেবতার অনুকূলে সম্পদ উৎসর্গ করাকে দেবোত্তর বলে।

২. ওয়াকফ ইসলাম ধর্মের একটি বিধান। আর দেবোত্তর হিন্দু ধর্মের একটি বিধান।

৩. ওয়াকফ জনকল্যাণকর, ধর্মীয় ও আত্মীয় স্বজনের কল্যাণে করা যায় কিন্তু দেবোত্তরের ক্ষেত্রে সমুদয় সম্পত্তিই ধর্মীয় কাজে ব্যবহৃত হয়।

৪. ওয়াকফ সম্পত্তি যিনি রক্ষাণাবেক্ষণ করেন তাকে মোতয়াল্লী বলে। অপরদিকে দেবোত্তর সম্পত্তি যিনি দেখা-শোনা করেন তাকে সেবায়েত বলে।

৫. ওয়াকফ সম্পত্তি এবং তার আয় দিয়ে মুসলমানদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন সমাজকল্যাণ মুলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়। আর দেবোত্তর সম্পত্তির মাধ্যমে হিন্দুদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠানের ব্যয়ভার বহন করা হয়।

ধর্মীয় ভাবে দু'টি প্রতিষ্ঠান আলাদা হলে ও উভয়ের উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ অথবা সৃষ্টি কর্তার সন্তুষ্টি অর্জন, পাপ স্খলন, পারলৌকিক সুখ-সমৃদ্ধি, আত্মতৃপ্তি, জনসমর্থন ও প্রশংসা অর্জন করা।

সার-সংক্ষেপ

হিন্দু ধর্মের বিধান মতে পাপমোচন, স্বর্গলাভ এবং ভগবানের সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে দেবতার নামে কোন হিন্দুর সম্পত্তি আংশিক বা সম্পূর্ণ উৎসর্গ করাকেই দেবোত্তর বলা হয়। ধর্মীয় শিক্ষামুলক প্রতিষ্ঠান, অনাথ আশ্রম, ধর্মীয় অনুষ্ঠানের ব্যয় নির্বাহ এবং মানব সেবামুলক কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে দেবোত্তর সম্পত্তি ব্যবহার করা হয়। দেবোত্তর সম্পত্তি দেখা শুনার দায়িত্বে একজন সেবায়েত নিয়োজিত থাকেন। বাংলাদেশে ধর্ম মন্ত্রণালয়ের অধীনে ওয়াকফ প্রশাসক দেবোত্তর সম্পত্তির সার্বিক তত্ত্বাবধান করে থাকেন। ওয়াকফ ও দেবোত্তরের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য হল ওয়াকফ ইসলাম ধর্মের একটি বিধান আর দেবোত্তর হিন্দু ধর্মের একটি বিধান।

পাঠোত্তর মুল্যায়ন – ৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। দেবোত্তর কোন ধর্মের প্রথা ?

ক) খ্রীষ্ট ধর্মের খ) বৌদ্ধ ধর্মের

গ) হিন্দু ধর্মের ঘ) ইসলাম ধর্মের।

২। দেবোত্তর সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষন কারীকে কি বলে?

ক) রক্ষণাবেক্ষনকারী খ) তত্ত্বাবধানকারী

গ) সেবায়েত ঘ) মোতওয়াল্লি।

পাঠ-৮.৬ ঃ বায়তুলমাল

উদ্দেশ্য

এই অধ্যায়টি পাঠ করে আপনি---

- ☞ ৮.৬ঃ১ বায়তুলমাল কি বলতে পারবেন
- ☞ ৮.৬ঃ২ বায়তুলমালের আয়ের উৎস গুলো দেখাতে পারবেন
- ☞ ৮.৬ঃ৩ সমাজকল্যাণে বায়তুলমালের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।

৮.৬ঃ১ বায়তুলমাল

ইসলামের যুগান্তকারী এক সৃষ্টি, কল্যাণ রাষ্ট্রের পথিকৃৎ এবং আধুনিক সমাজকল্যাণের সুসংগঠিত ও প্রাতিষ্ঠানিক বৈশিষ্ট্যের স্বাক্ষর বহনকারী সনাতন সমাজকল্যাণ হচ্ছে বায়তুল মাল। বায়তুল মালের আদর্শ ও দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আধুনিক বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্রের সামাজিক নিরাপত্তা, দরিদ্র আইন আর জনকল্যাণ তথা সমাজকল্যাণ কর্মসূচি ও বিভাগসমুহ।

আরবী বায়াত শব্দের অর্থ কর বা আগার এবং মাল শব্দের অর্থ সম্পদ সুতরাং বায়তুলমালের শাব্দিক অর্থ হলো সম্পদাগার। সাধারণত রাষ্ট্রীয় কোষাগারকেই বায়তুলমাল বলা হয়। ব্যবহারিক অর্থে বায়তুলমাল বলতে ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় কোষাগার বা সরকারী তহবিলকে বুঝায়। বায়তুলমালে রক্ষিত অর্থ ও সম্পদ রাষ্ট্র পরিচালনা সহ রাষ্ট্রের গরীব, দুঃখী, অসহায়, এতিম ও পঙ্গু সহ সকল নির্ভরশীলদের কল্যাণের জন্য ব্যয় করা হত। রাসুলুল্লাহ (সঃ) এর সময় থেকে বায়তুলমালের সূচনা হয়। হযরত ওমর (রাঃ) এর সময়ে বায়তুলমাল প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। তখন বায়তুলমালে প্রচুর ধনসম্পদ জমা হত। ইসলামী বিধান মতে বায়তুলমালের আয়-ব্যয় পরিচালিত হতো।

বিশ্ব মানবতার মুক্তির মহান দিশারী হজরত মুহাম্মদ (স) সর্বপ্রথম মসজিদ কেন্দ্রিক ক বায়তুলমাল প্রতিষ্ঠা করেন যা পরে অন্যত্র স্থাপিত হয়। "যুদ্ধক্ষেত্রে হস্তগত ধনসম্পদের (গানীমত) $\frac{৪}{৫}$ অংশ সৈনিকদের মাঝে বন্টিত হবে। অপর $\frac{১}{৫}$ অংশ এর $\frac{১}{৩}$ অংশ বায়তুলমালে জমা করা হত। মহানবী (স) এর নিজের ১ অংশসহ বায়তুলমালের অংশ রাষ্ট্রের জনকল্যাণমুলক কাজে ও দীনদুঃখী, অনাথদের জন্য ব্যয় করা হত।

মহানবী (স) কিংবা হজরত আবু বকর (রা) এর আমলে পূর্ণাঙ্গ বায়তুলমাল বা সরকারি কোষাগার ছিল না। অর্থ রাজধানীতে আসামাত্র বা বন্টন করে দেয়া হত। কিন্তু আল ওয়ালিদ বিন হিশামের পরামর্শক্রমে খলিফা ওমর (রা) মদীনায় সর্বপ্রথম বায়তুল মাল প্রতিষ্ঠা করেন এবং আবদুল্লাহ বিন আকরামকে কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন।" পরবর্তীতে রাষ্ট্রের অন্যান্য প্রদেশেও বায়তুলমাল স্থাপন এবং কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হয়; যারা গভর্ণর থেকে স্বাধীন ছিলেন।

পূণ্যভূমি মদীনা থেকে বায়তুলমাল ইসলামি রাষ্ট্রের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। খলিফা ওমরের সময় থেকে বায়তুলমালে ধনসম্পদ জমা হতে থাকে এবং তখন থেকেই মুসলিম ছাড়াও অমুসলিম নাগরিকগণ সুফল ভোগ করতে থাকে। আধুনিক যুগের ন্যায় তখনকার দিনে নাগরিকদের ভাতা ও বৃত্তির ব্যবস্থা করা হয়।

৮.৬ঃ২ বায়তুলমালের আয়ের উৎস ঃ

বায়তুল মালের আয়ের উৎস গুলো হলো-

১. মুসলমানদের ভূমি রাজস্ব ও খনিজ সম্পদের রয়ালটি।
২. গনিমাতের মাল।
৩. বিনাযুদ্ধে প্রাপ্ত ধনসম্পদ।
৪. অমুসলিমদের অধিকৃত জমির খাজনা।
৫. দেশের প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যে আদাইকৃত চাঁদা বাবদ গৃহীত অর্থ।
৬. উত্তরাধিকার বিহীন সম্পত্তি।
৭. অমুসলিমদের কাজ থেকে আদায়কৃত জিজিয়া বা কর ও
৮. জনগণের দেয়া যাকাত।

৮.৬ঃ৩ সমাজকল্যাণে বায়তুলমালের গুরুত্ব

বায়তুলমাল ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক নিরাপত্তা ও সমাজকল্যাণমুলক প্রতিষ্ঠান। যার দর্শন ও আদর্শ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বিশ্বের বহু রাষ্ট্রের জনকল্যাণ তথা সমাজকল্যাণমুলক প্রতিষ্ঠানের অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে।

১. **সামাজিক নিরাপত্তা ঃ** বিশ্বের ইতিহাসে প্রথম বারের মত জনগণের সামাজিক নিরাপত্তার দৃষ্টান্ত স্থাপন করে বায়তুলমাল। এর মাধ্যমেই রাষ্ট্রের দুঃস্থ, অসহায়,অক্ষম প্রভৃতি শ্রেণীর জন্য ন্যূনতম, মৌল মানবিক চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা করা হয়। খলিফা ওমর (রা) নিজের হাতেই নিজের অনেক সময় বায়তুলমাল থেকে দুঃস্থ-অসহায়দের জন্য এ ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন।

২. **বৈষয়িক সহায়তা ঃ** বায়তুল মাল গরিব-দুঃখীদের অন্যতম বৈষয়িক সাহায্যদানের উৎস। এর মাধ্যমে তাদের অর্থ অন্ন, বস্ত্র প্রভৃতি বস্তুগত সাহায্য প্রদান করা হত।

৩. **যাকাতের সহায়ক ঃ** যাকাতের অর্থ পৃথকভাবে বায়তুলমালে জমা রাখা হত এবং নির্ধারিত ৮ খাতে (দরিদ্র, মিসকিন, জাকাতকর্মী, নওমুসলিম, দাস-দাসী, ঋণী, মুজাহিদ ও মুসাফির) যাকাতের অর্থ সংকুলান না হলে বায়তুলমাল থেকে সাহায়তা করা হত। সুতরাং বায়তুলমাল যাকাতের সহায়তা ও পরিপূরক কাজ করত।

৪. **ঋণদান ঃ** বায়তুলমাল ইসলামি বিধান মতে সুদমুক্ত ঋণ (করজে হাছানা) প্রদান করত। অভাবগ্রস্থ এ ঋণ নিয়ে প্রয়োজন মেটাতে পারত।

৫. **বিনিয়োগ ঃ** শুধু করজে হাছানা নয় বায়তুলমাল বিনিয়োগকল্পে ও ঋণপ্রদান করত। এদিক থেকে বায়তুলমাল বর্তমানের ঋণদান প্রকল্প, সমিতি প্রভৃতির আশ্রয়স্থল।

৬. **দারিদ্য বিমোচন ঃ** বায়তুলমাল দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এর মাধ্যমে দুস্থ, দরিদ্র, আসহায় শ্রেণীকে রক্ষা করা হয়। কর্মসংস্থান সৃষ্টির ফলে জনগণের বেকারত্ব নিরসন হয়। ফলে দারিদ্র্যমোচন সম্ভব হয়।

৭. **পুনর্বাসন ঃ** বায়তুলমালের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী, বয়স্ক ও এতিম শিশুদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হত।

৮. **জনকল্যাণ ও সমাজসেবা ঃ** সমাজকল্যাণের অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ ও সঙ্গতিপূর্ণ দিক জনকল্যাণ ও সমাজসেবামুলক বিভিন্ন কাজ বায়তুল মালের মাধ্যমে সম্পন্ন হত। বায়তুলমাল জনগণের সম্পত্তি হিসেবে স্বীকৃত ছিল।

৯. **রাষ্ট্রিয় উন্নয়ন ঃ** বায়তুলমালে সঞ্চিত ধনসম্পদ থেকে জনগকল্যাণে ব্যয়ের পর রাষ্ট্রের উন্নয়নমূলক কাজে ব্যয় হতো।

১০. **সম্পদের সুষম বন্টন ঃ** বায়তুলমালে গচ্ছিত সম্পদ জনগণের মধ্যে সুষম বন্টন করা হত। স্বাভাবিকভাবেই এতে দরিদ্ররা বেশি উপকৃত হত। সুতরাং সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় বায়তুলমালের ভূমিকা অনন্য।

উপরিউক্ত আলোচনার মাধ্যমে বলা যায়, আধুনিক সমাজকল্যাণের বিভিন্ন কার্যক্রম এবং উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের সাথে বায়তুলমাল ব্যাপকভাবে সঙ্গতিপূর্ণ। সুতরাং সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে বায়তুলমালের গুরুত্ব অপরিসীম ও অতুলনীয়।

সার-সংক্ষেপ

আরবী শব্দ বায়তুল মাল অর্থ সম্পদাগার হলে ও সাধারণত রাষ্ট্রীয় কোষাগারকেই বায়তুলমাল বলা হয়। এটি ইসলামী রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় জনগণের কল্যাণের লক্ষ্যে গঠিত একটি মৌলিক প্রতিষ্ঠান। রাসুলুল্লাহ (সঃ) এর সময় থেকে মসজিদ কেন্দ্রিক বায়তুলমাল চালু হয়। হযরত ওমর (রাঃ) সময়কালে ইহা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। বায়তুলমালের আয়ের উৎস হল ভূমি রাজস্ব, গনিমতের মাল, বিনাযুদ্ধে প্রাপ্ত সম্পদ, আদাইকৃত চাঁদা, জিজিয়া বা কর, যাকাতের অর্থ ইত্যাদি। রাষ্ট্রের গরীব, দুঃখী, অসহায়, এতিম ও পঙ্গু সহ সকল নির্ভরশীলদের কল্যাণে বায়তুলমাল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। সমাজের নিম্নবেতন ভুক্ত কর্মচারী ক্ষুদ্র কৃষক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের মৌল মানবিক চাহিদা পূরণে ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধানে বায়তুল মালের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বর্তমানে বায়তুলমালের অস্তিত্ব না থাকলেও এর লক্ষ্য ও কার্যক্রম বিভিন্নভাবে উন্নত ও উন্নয়নশীল সকল দেশেই সমাজকল্যাণ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে ।

পাঠোত্তর মুল্যায়ন – ৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। সর্ব প্রথম বাইতুল মাল কার আমল থেকে প্রতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে?

ক) হযরত মোহাম্মদ (সঃ) খ) হযরত আবু বকর (রঃ)

গ) হযরত ওমর (রঃ) ঘ) হযরত আলী (রঃ)।

২। বাইতুলমালকে কি বলা হয়?

ক) সম্পদাগার খ) রাষ্ট্রীয় কোষাগার

গ) রাষ্ট্রীয় ধনভান্ডার ঘ) কোনটিই নয়।

পাঠ-৮.৭ ঃ ধর্মগোলা

উদ্দেশ্য

এই অধ্যায়টি পড়ে আপনি----

- ☞ ৮.৭ঃ১ ধর্মগোলা কি বলতে পারবেন
- ☞ ৮.৭ঃ২ ধর্মগোলার পটভূমি উলেখ করতে পারবেন
- ☞ ৮.৭ঃ৩ ধর্ম গোলার কার্যক্রম বলতে পারবেন
- ☞ ৮.৭ঃ৪ ধর্মগোলা পরিচালনার পদ্ধতি বলতে পারবেন
- ☞ ৮.৭ঃ৫ সমাজকল্যাণে ধর্মগোলার গুরুত্ব দেখাতে পারবেন।

৮.৭ঃ১ ধর্মগোলা

ধর্মগোলা সনাতন সমাজকল্যাণের অন্যতম দৃষ্টান্ত। দুর্ভিক্ষ অনাহার ও দুর্যোগকালীন পরিস্থিতি মোকাবেলার উদ্দেশ্যে সমষ্টিভিত্তিক শস্যভান্ডার গড়ে তুলে দারিদ্র্য ও অনাহারক্লিষ্ট জনসাধারণের মাঝে বিতরণের মাধ্যমে দুর্ভিক্ষ ও অনাহারী মৃত্যু প্রতিরোধকল্পে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি ভারতিয় উপমহাদেশের নিজস্ব সনাতন সমাকল্যাণ প্রতিষ্ঠান।

সাধারণতঃ 'ধর্মগোলা' হচ্ছে এক বিশেষ শস্যভাণ্ডার। বাঁশ বেত প্রভৃতি দ্বারা তৈরি গোলাকার ভাণ্ডার বা গুদামঘর যা গ্রামাঞ্চলে তৈরি হয় এবং বাংলাদেশে গ্রামদেশে এখনো এর অস্তিত্ব বিদ্যমান। এটি স্থানীয় বা এলাকাভিত্তিক এমন এক শস্যভাণ্ডার যাতে ফসলের মৌসুমে কৃষকদের কাছ থেকে উদ্ধৃত্ত শস্য জমা করে গঠিত হয় এবং দুর্ভিক্ষ ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় বিতরণ করা হয়। কৃষক ও প্রান্তিক চাষীরা এ থেকে বিনা সুদে শস্য সংগ্রহ করত এবং ফসল কাটার পর পরিবেশোধ করত।

৮.৭ঃ২ ধর্মগোলার পটভূমি

ব্রিটিশ শাসনামলে এদেশে অসংখ্যা (৫০-এর বেশি) ও ব্যাপক দুর্ভিক্ষ সংঘটিত হয়। তন্মধ্যে 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' খ্যাত বাংলা ১১৭৬ (ইংরেজি ১৭৭০) সালের ও ২য় বিশ্বযুদ্ধকালীন ১৯৪২-'৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ উল্লেখযোগ্য। এসব দুর্ভিক্ষের পরিপ্রেক্ষিতে অনাহার, মহামারি ও মৃত্যুর বিভীষিকা তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার ও সচেতন মানবহিতৈষী ব্যক্তিবর্গের চিন্ত াভাবনায় গড়ে ওঠে ধর্মগোলা।

৮.৭ঃ৩ ধর্মগোলার কার্যক্রম নিম্নরূপ ঃ

১. ফসলের মওসুমে কৃষকদের থেকে খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও সমষ্টি শস্যভাণ্ডার গঠন।
২. দুর্ভিক্ষ ও দুর্যোগকালে সংগৃহীত খাদ্যশস্য বিতরণ।
৩. দরিদ্র কৃষক ও প্রান্তিক চাষীদের মধ্যে বিনাসুদে খাদ্য ঋণ প্রদান।
৪. অনাহারী, মৃত্যু ও মহামারি প্রতিরোধ।
৫. গ্রামীণ মহাজন ও সুদখোরদের হাত থেকে কৃষককূলকে রক্ষা;
৬. নিজস্ব সম্পদের ভিত্তিতে আঞ্চলিক ও সমষ্টিগত বিপর্যয় মোকাবেল।

৮.৭ঃ৪ ধর্মগোলার পরিচালনা

ধর্মগোলা পরিচালনায় নিম্নোক্ত ব্যবস্থাসমুহ গৃহীত হয়

১. জেলা ওমহকুমা কর্মকর্তাদের তত্ত্বাবধানে ইউনিয়ন বোর্ড (লোকাল বোর্ড) ধর্মগোলা স্থাপন করে।
২. গ্রামীণ ফুড কমিটি এর সার্বিক পরিচালনা করবে; যা গ্রামবাসীদের দ্বারা নির্বাচিত।
৩. সার্কেল অফিসার ও ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টগণ এর সার্বিক তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করবে।

৮.৭ঃ৫ ধর্মগোলার গুরুত্ব

সমাজকল্যাণে ধর্মগোলার গুরুত্ব অপরিসীম। এর ভিত্তিতে তৎকালীন দুরবস্থা মোকাবেলায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা লক্ষ্যণীয়।

১. **স্থানীয় উদ্যোগ ঃ** স্থানীয় প্রচেষ্টায় দুর্ভিক্ষ, মহামারি ও বিপর্যয়মুলক পরিস্থিতি মোকাবেলা।

২. **সম্পদের সদ্ব্যবহার ঃ** নিজস্ব সম্পদের ভিত্তিতে নিজেদের সমস্যার সমাধান।

৩. **সমষ্টিগত পদক্ষেপ ঃ** সমষ্টিগত উদ্যোগে মোকাবেলা ও চাহিদাপূরণ।

৪. **ত্রাণ ও পূনর্বাসন ঃ** দুস্থ, অসহায় ও আর্তমানবতার কল্যাণে সমাজসেবা ও জনকল্যাণ।

৫. **ঋণদান ঃ** ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের মাঝে বিনাসুদে ঋণদান মহাজন ও সুদখোরদের কবল থেকে কৃষককুলকে রক্ষার এক অনবদ্য পদক্ষেপ।

৬. **সরকারি অংশগ্রহণ ঃ** দুর্ভিক্ষ পীড়িত, অনাহারী-অসহায় মানুষের সরকারি প্রচেষ্টা ও জনকল্যাণের অংশগ্রহণের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

সুতরাং উপর্যুক্ত আলোচনায় পরিশেষে দেখা যায়, ধর্মগোলার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যে সাথে আধুনিক সমাজকল্যাণের সমাঞ্জস্যতা বিদ্যমান। স্থানীয় ও সমষ্টি উদ্যোগ, সম্পদের সদ্ব্যবহার সমাজসেবা ও কল্যাণকর পদক্ষেপ গ্রহণের সাথে সমাজকল্যাণের তাৎপর্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান গ্রামীণ সমাজসেবা কর্মসূচির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ধর্মগোলা।

সার-সংক্ষেপ

ধর্মগোলা হলো অবিভক্ত ভারতে সৃষ্ট একটি বিশেষ শস্য ভান্ডার যাতে মৌসুমের সময় স্থানীয় ভিত্তিতে উদ্বৃত্ত শস্য সংগ্রহ করে মজুদ রাখা হত এবং দুর্ভিক্ষ বা খাদ্যাভাব দেখা দিলে দুর্গতদের মধ্যে বিনাসুদে শস্য বিতরণ করা হত। ধর্মগোলা এযাবতকাল আর্ত-মানবতার সেবা করে সমাজকল্যাণ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। ধর্মগোলার অস্তিত্ব বর্তমানে নেই কিন্তু সরকারী উদ্যোগে এই প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তুললে খাদ্য সমস্যার সমাধান অনেক সহজতর হয়ে যাবে।

পাঠোত্তর মুল্যায়ন – ৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। ধর্মগোলা কী?

ক) অর্থভান্ডার খ) খাদ্য ভান্ডার

গ) সম্পদাগার ঘ) এক বিশেষ শস্য ভান্ডার।

২। ধর্মগোলার সাহায্যের প্রকৃতি কী ?

ক) সুদ ভিত্তিক শস্য বিতরণ খ) বিনাসুদে শস্য বিতরণ

গ) আর্থিক সাহায্য দান ঘ) বস্ত্রদান।

পাঠ-৮.৮ ঃ সনাতন সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে সরাইখানা

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়ে আপনি ---

- ☞ ৮.৮ঃ১ সরাইখানা কি বলতে পারবেন।
- ☞ ৮.৮ঃ২ সরাইখানার পটভূমি ও কার্যক্রম বলতে পারবেন।
- ☞ ৮.৮ঃ৩ সরাইখানার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৮.৮ঃ১ সরাইখানা

সাধারণভাবে বলা যায় সরাইখানা হচ্ছে বিশ্রামাগার। মধ্যযুগে বর্তমানের ন্যায় উন্নত রাস্তাঘাট ও যানবাহন ছিল না। তখন মানুষকে পায়ে হেটে, ঘোড়ায় চড়ে যাতায়াত করতে হত। দুর্গম রাস্তা এবং পাহাড় জঙ্গল পাড়ি দিতে হলে বিশ্রাম ও রাত্রি যাপনের প্রয়োজন হত। সরাইখানায় তখন মানুষ আশ্রয় নিত। ক্লান্ত পথিক, মুসাফির ও পর্যটককের বিনামুল্যে বিশ্রাম, খাদ্য, পানীয়, রাত্রি যাপন এবং চিকিৎসার সুযোগ দানের জন্য রাস্তার পাশে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে পরিচালিত সাময়িক ভাবে যে আশ্রয় কেন্দ্র স্থাপন করা হত তাকে সরাইখানা বলে।

ফকির, দরবেশ, আউলিয়া, ধর্মপ্রচারক, জনদরদী, শাসক, পথিমধ্যে অথবা স্ব-স্ব খানকা, আস্তানা, দরবার শরীফ ইত্যাদি স্থানে সরাইখানা স্থাপন করতেন। বর্তমানে সরাইখানার অস্তিত্ব নেই বললেই চলে। এমন সরাইখানার পরিবর্তে উন্নত মানের আবাসিক হোটেল, মোটেল, বোডিং, বিনোদন কেন্দ্র, ডাকবাংলা, সার্কিট হাউজ, পান্থনিবাস, পর্যটন কর্পোরেশন, রেষ্ট হাউজ ইত্যাদি চালু করা হয়েছে। এখানে পথীকদের আশ্রয় ও সেবা করা হয় টাকার বিনিময়ে।

৮.৮ঃ২ সরাইখানার পটভুমি

প্রাচীন ও মধ্যযুগে যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত বন্ধুর। তখনকার দিনে আজকের মত অত্যাাধুনিক যানবাহন ও ছিল না। নদীপথ ছাড়া পায়ে হেঁটে, ঘোড়া ও হাতি চড়ে, দোলায় চেপে বড়জোর গরুর গাড়িতে একস্থান থেকে অন্যস্থানে যেতে হত। আজকের একঘন্টার বাসযাত্রা কখনকার দিনে একদিন লাগত। তাছাড়া রাস্তাঘাট দুর্গম, পাহাড়-পর্বত ও বন-জঙ্গল পরিপূর্ণ ছিল। ফলে একযাত্রায় কয়েক দিন-রাত্রি প্রয়োজন হত। অধিকন্তু, দুর্গম পথে জান-মালের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হত। সুতরাং নিরাপদে যাত্রা ও আশ্রয় লাভের উদ্দেশ্যে বিশ্রামাগারের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভুত হয়।

এমতাবস্থায় মানবতাবোধ ও ধর্মীয় মুল্যবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে কিছু সমাজদরদী ও মহানুভব ব্যক্তি এবং প্রজাহিতৈষী শাসকবর্গ এগিয়ে আসেন এবং শ্রান্ত-ক্লান্ত পথিক, পর্যটক ও মুসাফিরদের অতিথি আদরে যাবতীয় সুযোগ-সুবিধাসহ রাস্তার পাশে সরাইখানা নির্মাণ করেন। পীর-দরবেশগন তাদের আস্তানার পাশে এ ধরণের সরাইখানা স্থাপন করতেন। আশ্রয় গ্রহনকারীগণ এখানে গৃহতুল্য আরাম অনুভব করতেন। এমনকি কোন কোন সরাইখানায় আপ্যায়ন সহ সেবাযত্নের যাবতীয় ব্যবস্থা মজুদ থাকত। তাছাড়া, এসব সরইখানাতে অসুস্থ্যদের জন্য সু-চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকত। সম্রাট শেরশাহ সোনারগাঁ থেকে সিন্ধু নদ পর্যন্ত যে বিখ্যাত গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড নির্মাণ করেন, তার পাশে অসংখ্য সরাইখানা নির্মাণ করেন। পরবর্তিতে প্রায় সকল প্রজাবৎসল শাসকই সরাইখানা স্থাপনে এগিয়ে আসেন।

৮.৮ঃ৩ সরাইখানার গুরুত্ব

ঐতিহ্যবাহী সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান সরাইখানা সমাজ ও মানবকল্যাণে অবদান রাখতে সক্ষম হয়।

১. সরাইখানায় পথিক, পর্যটক ও মুসাফিরগোষ্ঠী বিনা খরচে থাকা-খাওয়ার সুযোগ পায়।
২. এখানে আশ্রিতরা চোর-ডাকাত-খুনিদের হাত থেকে নিরাপত্তা লাভ করে।
৩. আশ্রয়গ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গের বিশ্রাম ও আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা করা হয়।
৪. অতিথিদের মত সরাইখানায় সকল সুবিধা প্রদান করা হয়।
৫. অসুস্থ্য ব্যক্তিবর্গের সুচিকিৎসার পদক্ষেপ নেয়া হয়।

বর্তমানকালে রাস্তাঘাটের উন্নয়ন এবং বিভিন্ন ধরনের উন্নত যানবাহনের প্রচলন হওয়ায় সরাইখানার প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে গেছে। তবে সরাইখানার বিকল্প হিসেবে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে রাস্তা ও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে রেষ্ট হাউজ, সার্কিট হাউজ, হোটেল, ডাকবাংলা, পান্থনিবাস, পর্যটন কর্পোরেশন ও আশ্রয়কেন্দ্র ইত্যাদি স্থাপন করা হয়েছে। পক্ষান্তরে সরাইখানা হচ্ছে মানবতাবোধ ও জনকল্যাণে উদ্বুদ্ধ শাসক ও সম্পদ শালীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত পথিক, মুসাফির ও পর্যটকদের জন্য একটি কল্যাণমুলক প্রতিষ্ঠান।

সার-সংক্ষেপ

সাধারণ অর্থে সরাইখানা হচ্ছে বিশ্রামাগার। প্রাচীন ও মধ্যযুগে ক্লান্ত পথিক, পীর, ফকীর, দরবেশ, আউলিয়া, মুসাফির, পর্যটকদের বিনামুল্যে নিরাপদ বিশ্রাম, খাদ্য, পানীয়, সরবরাহ, রাত্রি যাপন এবং চিকিৎসা সুযোগ দানের জন্য রাস্তার পাশে যে আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ করা হত তাই সরাইখানা। বর্তমানে হোটেল, রেষ্ট হাউজ, সার্কিট হাউজ, ডাক বাংলা, পান্থনিবাস, পর্যটনকেন্দ্র ও আশ্রয়কেন্দ্র সরাইখানার বিকল্প হিসেবে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে স্থাপন করা হয়েছে।

অনুশীলনী

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√ চিহ্ন দিন।

১। সরাইখানা কখন চালু হয় ?

ক) প্রাচীন ও মধ্যেযুগে খ) আধুনিক যুগে

গ) প্রাক-শিল্পযুগে ঘ) বর্তমান যুগে।

২। সরাইখানা হচ্ছে ----

ক) আশ্রয়খানা খ) পান্থশালা।

গ) বিশ্রামাগার ঘ) ডাকবাংলা।

পাঠ-৮.৯ ঃ সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে লঙ্গরখানা।

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়ে আপনি ----

- ☞ ৮.৯ঃ১ লঙ্গরখানা কি বলতে পারবেন।
- ☞ ৮.৯ঃ২ লঙ্গরখানা পটভুমি বলতে পারবেন।
- ☞ ৮.৯ঃ৩ লঙ্গরখানার গুরুত্ব বলতে পারবেন।

৮.৯ঃ১ লঙ্গরখানা

সমাজকল্যাণের ইতিহাসে অন্যতম সনাতন সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান 'লঙ্গরখানা' এক উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে রয়েছে; যা প্রাক-শিল্প যুগ-পেরিয়ে আধুনিক কালেও সম্প্রসারিত হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও বহাল তবিয়তে টিকে থাকার সম্ভাবনা জাগিয়েছে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণী নির্বিশেষে এ প্রতিষ্ঠানটি দুর্যোগ, দুর্ভিক্ষ ও বিপর্যয়কালীন পরিস্থিতিতে দুস্থ-অসহায় ও আর্তমানবতার সেবায় অপরিসীম অবদান রেখে চলেছে।

'লঙ্গরখানা' ফারসি শব্দ। এর অর্থ অন্নসত্র, যার মাধ্যমে দুর্গতদের মাঝে খাদ্য পানীয় বিতরণ করা হয়। সাধারণত দুর্ভিক্ষ, দুর্যোগ ও বিপর্যয় কবলিত নিরন্ন মানুষকে অকাল মৃত্যুর দ্বার থেকে রক্ষাকল্পে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যোগ বা সরকারি প্রচেষ্টায় বিনামুল্যে খাদ্যপানীয় বিতরেণের জন্য যে সাময়িক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয় তাকেই লঙ্গরখানা বলে। এ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রধানত বিপন্নদের মাঝে তৈরি খাবার বিতরণ করা হয়।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ বন্যা, খরা, অতিবৃষ্টি, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছাস, টর্নেডো, নদী ভাঙন, ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাত, ফসলহানী, দুর্ভিক্ষ, মহামারি এবং রাজনৈতিক বিপর্যয়, যুদ্ধ-বিগ্রহ, দাঙ্গা-হাঙ্গামা প্রভৃতি কারণে সৃষ্ট বিপর্যয়মুলক পরিস্থিতিতে জরুরি ভিত্তিতে বিনামুল্যে খাদ্যদ্রব্য বিতরণকারী প্রতিষ্ঠানই লঙ্গলখানা নামে পরিচিতি।

৮.৯ঃ২ পটভূমি ঃ

প্রাচীন ও মধ্যযুগে মুলত পীর-দরবেশ, ফকির-আওলিয়াগণ তাদের আস্তানার পাশে এবং সন্ন্যাসীগণ তাদের আশ্রমের পাশে মুসাফিরখানা ও লঙ্গরখানা খুলতেন। এখান থেকে তারা দুঃস্থ ও দরিদ্রদের মাঝে অন্ন, পানি, ওষুধ প্রভৃতি বিতরণ করতেন। পরবর্তীতে সুলতান ও শাসকগণ এ ধরনের প্রতিষ্ঠান প্রবর্তন করেন। তন্মধ্যে ফিরোজশাহ তুঘলকের দুর্ভিক্ষকালীন দুঃশাসন ও নিপীড়ন, নীল চাষ, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রভৃতি কারণে ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ ও খাদ্যাভাব দেখা দেয়। ফলে দুর্যোগময় পরিস্থিতিতে সমাজহিতৈষী ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের প্রচেষ্ঠায় কখনও বা সরকারের সহায়তায় অন্নছত্র, লঙ্গরখানা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান চালু করা হয়। এগুলো অভাবগ্রস্থ ও অনাহারক্লিষ্ট আদম সন্তানের মুখে বিনামুল্যে তৈরি খাদ্য তুলে দিয়ে প্রাণ রক্ষা করে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ (১৯৭১) ছাড়াও স্বাধীন হবার পর বেশ কিছু প্রাকৃতিক দুর্যোগ- বন্যা, খরা, জলোচ্ছ্বাস, টর্নেডো, মহাপ্লাবন এদেশের উপর দিয়ে বয়ে যায়। যেমন ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষ, ১৯৮৫, ৮৭ ও ৯১ সালের ঘূর্ণিঝড়, ১৯৮৭, ৮৮ ও ৯৮ সালের বন্যা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এসব পরিস্থিতি মোকাবেলায় সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে বহু লঙ্গরখানা স্থাপিত হয়।

৮.৯ঃ৩ লঙ্গরখানার গুরুত্ব

জাতি, ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণী, ধনী, দরিদ্র নির্বিশেষে প্রাকৃতিক ও রাজনৈতিক কারণে সৃষ্ট অনাহারী মানুষের জরুরী ভিত্তিতে খাদ্য, কাপড়-চোপড় ঔষধ ও পথ্যাদি বিতরণের জন্য লঙ্গরখানার বিকল্প নেই। চরম দরিদ্র, ক্ষুধার্ত, নিশ্চিত মৃত্যুর কবল থেকে বেঁচে থাকার জন্য লঙ্গর খানা আশার প্রদীপ স্বরূপ। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার পূর্বপর্যন্ত দুর্গত মানুষ লঙ্গরখানা থেকে সেবা পেয়ে থাকে। তাই লঙ্গরখানার গুরুত্ব অপরিসীম।

দুর্ভিক্ষ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ যতদিন থাকবে লঙ্গরখানার প্রয়োজনীয়তা ও ততদিন থাকবে। লঙ্গরখানার কার্যক্রম নিঃসন্দেহে সাময়িক কিন্তু বিপর্যয়মূলক পরিস্থিতি মোবাবেলায় এর বিকল্প নেই। অর্থাৎ দুঃস্থ অসহায়, নিরন্ন ও দূর্গত মানুষের কল্যাণে লঙ্গরখানার গুরুত্ব অতীতে ও ছিল, বর্তমানে ও আছে এবং ভবিষ্যতে ও থাকবে।

সার-সংক্ষেপ

প্রাচীনকাল হতে অদ্যাবধি প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন বন্যা, ভূমিককম্প, খড়া, দুর্ভিক্ষ ও মহামারি ইত্যাদি পরিস্থিতিতে দুর্গত মানুষকে বিনা মুল্যে খাদ্যসামগ্রী, পানীয়, কাপড়-চোপড়, ঔষধ, পথ্যাদি সরবরাহের জন্য যে অস্থায়ী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয় তা-ই লঙ্গরখানা নামে পরচিতি। মধ্যেযুগে সরকারী ও বেসরকারী ভাবে পথের পাশে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে এই লঙ্গর খানা খোলা হত। দুঃস্থ, অসহায়, নিরন্ন ও দুর্গত মানবতার কল্যাণে লঙ্গরখানার গুরুত্ব অতীতেও ছিল বর্তমানেও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে।

পাঠোত্তর মুল্যায়ন – ৯

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। লঙ্গরখানা কি ?

ক) অর্থ সাহায্যকারী প্রতিষ্ঠান
খ) কাপড়-চোপড় দানকারী প্রতিষ্ঠান
গ) কমমুল্যে খাদ্য দ্রব্য বিতরণকারী প্রতিষ্ঠান
ঘ) বিনামুল্য খাদ্য দ্রব্য বিতরণকারী প্রতিষ্ঠান।

২। লঙ্গরখানা থেকে সাহায্য পায় কারা ?

ক) গরীব মানুষেরা
খ) ভিক্ষুকেরা
গ) প্রতিবন্ধীরা
ঘ) দুর্গত মানবতা।

পাঠ-৮.১০ ঃ সনাতন সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে এতিমখানা

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়ে আপনি -------

- ☞ ৮.১০ঃ১ এতিমখানার ধারণা দিতে পারবেন
- ☞ ৮.১০ঃ২ এতিমখানার কার্যক্রম গুলো উল্লেখ করতে পারবেন
- ☞ ৮.১০ঃ৩ সমাজকল্যাণে এতিখানার গুরুত্ব দেখাতে পারবেন
- ☞ ৮.১০ঃ৪ এতিমখানা ও লঙ্গরখানার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবেন।

৮.১০ঃ১ এতিমখানা

সনাতন সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এতিমখানা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান বলা যায়। পিতৃহীন, মাতৃহীন ও পিতৃমাতৃহীন যাদের ভরণ-পোষণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও সেবা যত্নের জন্য কেউ নেই তাদের এতিম বলা হয়। পরিত্যক্ত, দুঃস্থ, নির্ভরশীল ও অসহায় শিশু, অনাথ শিশু-কিশোরদেরকে ও এতিম হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। এসব এতিম শিশুদের সার্বিক কল্যাণের জন্য যে প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছে সেগুলোকে এতিমখানা বলা হয়। সুতরাং বলা যায়, পিতৃহীন, মাতৃহীন ও পিতৃ-মাতৃহীন এবং দুঃস্থ পরিত্যক্ত, অনাথ শিশু-কিশোরদের লালন-পালন, রক্ষণাবেক্ষণ ও ভরণ-পোষণ ও সেবা-যত্নের জন্য সরকারী ও বেসরকারী ভাবে পরিচালিত যে প্রতিষ্ঠান, তা-ই এতিমখানা। উদাহরণস্বরূপ যেমন- সলিমুল্লাহ মুসলিম এতিমখানা, কদম মোবারক এতিমখানা ইত্যাদি।

এছাড়াও বিভিন্ন প্রকৃতির ও নামের প্রতিষ্ঠান ও রয়েছে যেগুলোতে অন্যান্য শিশু-কিশোরদের মত এতিম শিশু-কিশোরদেরকেও রাখা হয়। যেমন- দুঃস্থ নিবাস, শিশুসদন, শিশুপল্লী, শিশু আলয় ও শিশু পরিবার ইত্যাদি।

বিশেষতঃ ধর্মীয় দর্শনই মানুষকে এতিমখানা প্রতিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ করেছে। সকল ধর্মই বিশেষ করে ইসলাম ধর্ম এতিমদের কল্যাণকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে। আল্লাহর রাসুল (সাঃ) নিজে এতিমদের অত্যন্ত স্নেহ ও আদর-যত্ন করতেন।

সাধারনত বেসরকারী ভাবে বিত্তশালী ধর্মানুরাগী, পীর, ফকির, দরবেশ, আউলিয়াগণ এতিমখানা প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। তাছাড়া বর্তমানে বিভিন্ন ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মাদ্রাসা এবং সচ্ছল মসজিদ, এতিমখানা পরিচালনা করে থাকে। আর সরকারীভাবে পরিচালিত এতিমখানা গুলো হলে সলিমুল্লাহ মুসলিম এতিমখানা, কদম মুবারক এতিমখানা ইত্যাদি ছাড়া ও দুঃস্থ নিবাস, শিশুপল্লী, শিশু সদন ইত্যাদি।

পশ্চাত্যের ইংল্যান্ডে এতিমও অনাথদের কল্যাণে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের সূচনা হয় ১৬০১ সালে। পরবর্তীতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সরকারী পর্যায়ে এতিমখানা চালু হয়। বেসকারী, সরকারী এতিমখানা ও শিশুসদন ছাড়াও বেশ কিছু আন্তর্জাতিক সংস্থা আমাদের দেশে এতিমখানা পরিচালনা করছে এবং এদের নামও বিভিন্ন। যেমন তেরিডাস হোমস, আংকল এরিকস চিলড্রেন হোম, এনফ্যান্ট ড্যু মনডে, সেভ দ্যা চিলড্রেন, এস ও এস শিশু পল্লী, বালক নিবাস, অনাথ আশ্রম, শিশু সদন প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বর্তমানে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা শহরে ৭৩টি সরকারি শিশু সদন রয়েছে, যেখানে মোট ৯৫০০জন শিশুর রক্ষণাবেক্ষণ, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে। আর বেসরকারী এতিম খানার সংখ্যা ১৮০০ অধিক। বেসরকারী এতিমখানার মধ্যে সরকারী অনুদানপ্রাপ্ত এতিমখাণার সংখ্যা ১২৬৫টি।

৮.১০ঃ২ এতিমখানার কার্যক্রমসমুহ

এতিমখানা ও শিশু সদনের কার্যক্রমসমুহ মোটামুটি নিম্নরূপ ঃ

১. পরিচর্যা, ভরণপোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ।
২. অনুভূত ও মৌল চাহিদা পূরণ।
৩. শিক্ষা প্রদান।
৪. সামাজিকীকরণ ও সুনাগরিক হিসেবে গঠন।
৫. নির্মল চিত্তবিনোদন।
৬. প্রশিক্ষণ দান।
৭. সুচিকিৎসার ব্যবস্থ্যাকরণ।
৮. পুনর্বাসন ও মেয়েদের বিয়ে দান।

৮.১০ঃ৩ সমাজকল্যাণে এতিমখানার গুরুত্ব

সনাতন সমাজকল্যাণ সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলেও আধুনিক পেশাদার সমাজকর্মে এতিখানার গুরুত্ব ও ভূমিকা অপরিসীম।

১. **আবাসন ও লালন-পালন ঃ** এতিম ও অনাথ শিশুদের বেঁচে থাকার জন্য এতিমখানাসমুহ প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহন করে তাদের আবাসন ও লালন পালনের ব্যবস্থা করে।

২. **পারিবারিক স্নেহ-ভালবাসা ঃ** বর্তমানে এতিখানায় শিশুদের পারিবারিক স্নেহ-ভালবাসা ও বন্ধুত্বপুর্ণ পরিবেশ গঠনে প্রতি ২০ জন শিশু নিয়ে একটি শিশু পরিবার গঠন করা হয়। এখানে একজন বেতনভুক্ত 'মা' নিয়োগ করা হয়। কোন কোন প্রতিষ্ঠানে একজন ভাই নিয়োগ করা হয়।

৩. **শিক্ষা ঃ** এতিম শিশুদের শিক্ষার্থে বিদ্যালয় স্থাপন, পরিচালনা শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ, বৃত্তিপ্রদান, উচ্চ শিক্ষার্থে অন্যত্র প্রেরণ প্রভৃতির মাধ্যমে শিক্ষা বিস্তার মহান ভুমিকা পালন করে।

৪. **মৌল ও অনুভূত চাহিদা পূরণ ঃ** এতিমদের খাদ্য, বস্ত্র, স্বাস্থ্য প্রভৃতিসহ অনুভূত চাহিদা পূরণের মাধ্যমে সুস্থ-সকল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা হয়।

৫. **সামাজিকীকরণ ঃ** শিশুদের সুষ্ঠু ব্যক্তিত্ব গঠন, মানসিক বিকাশ ও উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী হবার জন্য সুষ্ঠু সামাজিকীকরণের ব্যবস্থা গ্রহন করে।

৬. **নিরাপত্তা ঃ** দুর্ঘটনা কবলিত শিশুকে ও শিশুদের পিতামাতার মুত্যুর পর এতিমখানা তাদের সঠিক নিরাপত্তা প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৭. **স্বনির্ভরতা অর্জন ঃ** এতিমদের আত্মনির্ভরশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন কারিগরি, বৃত্তিমুলক ও শৈল্পিক বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে।

৮. **চিত্তবিনোদন ঃ** শিশুদের পূর্ণাঙ্গ বিকাশের লক্ষ্যে চিত্তবিনোদন, খেলাধুলা, পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান, ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শন, শিক্ষা সফর প্রভৃতির ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

৯. **ধর্মীয় অনুষ্ঠান ঃ** শিশুদের নিয়মিত ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন ও শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করা হয়।

১০. **পুনর্বাসন ঃ** শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এতিমদের সমাজেপুনর্বাসনে এতিমখানার অবদান ব্যাপক। তাছাড়া মেয়েদের বিয়ের মাধ্যমে পুনর্বাসন করে এতিমখানা সমাজের কল্যাণ ত্বরান্বিত করে।

অবশেষে, উপর্যুক্ত আলোচনার মাধ্যমে সিদ্বান্ত নেয়া যায় যে, এতিমখানা সমূহ আধুনিক যুগে সমাজকল্যাণের ক্ষেত্রে এক তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখে যাচ্ছে।

৮.১০ঃ৪ এতিমখানার ও লঙ্গরখানার মধ্যে পার্থক্য ঃ

এতিমখানা	লঙ্গরখানা
১। পরিবারের বাইরে অনাথ-এতিম, শিশু-কিশোরদের ভরণ-পোষণ ও লালনপালনের প্রতিষ্ঠান হল এতিমখানা।	১। প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা দুর্ভিক্ষের সময় অসহায় অনাহারী মানুষকে কোন স্থানে বিনামুল্যে রান্না করা খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থা হল লঙ্গরখানা।
২। এতিমখানা একটি আবাসিক প্রতিষ্ঠান।	২। লঙ্গরখানা একটি অনাবাসিক সাহায্য ব্যবস্থা।
৩। এতিমখানার সেবা নির্দিষ্ট বয়েসের এতিমদের জন্য।	৩। লঙ্গরখানার সাহায্য সকল বয়েসের অনাহারী মানুষের জন্য।
৪। এতিমখানা যে কোন সময়ে বা পরিস্থিতিতে স্থাপিত হয়।	৪। লঙ্গরখানা প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও দুর্ভিক্ষের সময় স্থাপিত হয়।
৫। এতিমখানা একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান।	৫। লঙ্গরখানা একটি অস্থায়ী ব্যবস্থা।
৬। এতিমখানা এতিমদের সকল মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণ করা হয়।	৬। লঙ্গরখানায় সাধারনত রান্না করা খাদ্য বিতরণ করা হয়।
৭। যৌথ পরিবার ব্যবস্থা হ্রাস পাওয়ায় এতিমখানার প্রয়োজনীয়তা দিন দিন বুদ্ধি পাচ্ছে।	৭। প্রাকৃতকি দুর্যোগ ও দুর্ভিক্ষ ছাড়া সাধারনত লঙ্গরখানার প্রয়োজন নেই।

সার-সংক্ষেপ

সনাতন সমাজকল্যাণের একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচী হচ্ছে এতিমখানা। পিতৃহীন, মাতৃহীন বা মাতৃ-পিতৃহীন এবং নির্ভরশীল দুঃস্থ ও অসহায় শিশুদের যে প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে লালনপালন, ভরণ-পোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করা হয় তা-ই এতিমখানা। বেসরকারীভাবে অসংখ্য ও এতিমখানা পরিচালিত হচ্ছে। সরকারীভাবে দুঃস্থ নিবাস, শিশুসদন, শিশুপল্লী ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান এতিমখানার বিকল্প হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে। গঠন কাঠামো, ব্যবস্থাপনা, প্রকৃতি ও পরিধিগত দিক থেকে এতিমখানা ও লঙ্গরখানার মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। কর্মপরিধি বিচার বিশ্লেষণে দেখা যায় এতিমখানার গুরুত্ব অপরিসীম।

পাঠোত্তর মুল্যায়ন – ১০

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। এতিমেরা যেখানে লালিত পালিত হয় তাকে কি বলে?

ক) সরাইখানা খ) লঙ্গরখানা

গ) ধর্মগোলা ঘ) এতিমখানা।

২। ইংল্যান্ডে এতিম ও অনাথদের কল্যাণে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের সূচনা হয় কত সালে ?

ক) ১৫৩৬ সাল খ) ১৫৫৬ সাল

গ) ১৬০১ সাল ঘ) ১৮৩৪ সাল।

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন ঃ

১। দানশীলতা কী? ৮.১ঃ১
২। দানশীলতার ত্রুটি/সীমাবদ্ধতা গুলো কী? ৮.১ঃ৩
৩। যাকাত কী? ৮.২ঃ১
৪। যাকাত আদায়ের খাত গুলো কী কী? ৮.২ঃ৩
৫। যাকাত প্রদানের খাতগুলো কী কী? ৮.২ঃ৪
৬। সদ্‌কা কী? ৮.৩ঃ১
৭। সদ্‌কা কেন দেয়া হয়? ৮.৩ঃ১
৮। ওয়াকফ কী? ৮.৪ঃ১
৯। ওয়াকফ কত প্রকার ও কী কী? ৮.৪ঃ২
১০। ওয়াকফ সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা কী? ৮.৪ঃ৩
১১। দেবোত্তর কী? ৮.৫ঃ১
১২। দেবোত্তর কত প্রকার ও কী কী? ৮.৫ঃ২
১৩। বায়তুলমাল কী? ৮.৬ঃ১
১৪। বায়তুলমাল কখন চালু হয়? ৮.৬ঃ১
১৫। বায়তুলমালের আয়ের উৎস কী? ৮.৬ঃ২
১৬। ধর্মগোলা কী? ৮.৭ঃ১
১৭। ধর্মগোলোর কার্যক্রম গুলো কী? ৮.৭ঃ২
১৮। ধর্ম গোলা পরিচালনার পদ্ধতি কী? ৮.৭ঃ৩
১৯। সরাইখানা কী? ৮.৮ঃ১
২০। লঙ্গরখানা কী? ৮.৯ঃ১
২১। লঙ্গরখানা কখন চালু হয়? ৮.৯ঃ১
২২। এতিমখানা কী? ৮.১০ঃ১
২৩। এতিম কারা? ৮.১০ঃ১
২৪। বিভিন্ন প্রকৃতির এতিমখানা গুলো কী? ৮.১০ঃ১

রচনামূলক উত্তর-প্রশ্ন ঃ

১। সমাজকল্যাণ ক্ষেত্রে যাকাতের গুরুত্ব আলোচনা করুন? উঃ ৮.২ঃ৫
২। সমাজকল্যাণে সদ্‌কার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন? উঃ ৮.৩ঃ২
৩। সমাজকল্যাণ ক্ষেত্রে ওয়াকফের গুরুত্ব কী? উঃ ৮.৪ঃ৪
৪। যাকাত ওয়াকফের মধ্যে পার্থক্য দেখাও? উঃ ৮.৪ঃ৫
৫। সমাজকল্যাণ ক্ষেত্রে দেবোত্তরের গুরুত্ব কী? উঃ ৮.৫ঃ৩
৬। ওয়াকফ ও দেবোত্তরের মধ্যে পার্থক্য দেখাও? উঃ ৮.৫ঃ৫
৭। সমাজকল্যাণে বায়তুলমালের গুরুত্ব বর্ণনা কর? উঃ ৮.৬ঃ৩
৮। সমাজকল্যাণে ধর্মগোলার গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। উঃ ৮.৭ঃ৫

৯। সরাইখানার পটভূমি ও কার্য্যক্রম লিখুন। উঃ ৮.৮ঃ২

১০। সরাইখানা গুরুত্ব লিখুন। উঃ ৮.৮ঃ৩

১১। লঙ্গরখানার পটভূমি ও গুরুত্ব আলোচনা করুন। উঃ ৮.৯ঃ২, ৮.৯ঃ৩

১২। সমাজকল্যাণ ক্ষেত্রে এতিমখানার গুরুত্ব বর্ণনা করুন। উঃ ৮.১০ঃ৩

১৩। এতিমখানা ও লঙ্গরখানা মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করুন। উঃ ৮.১০ঃ৪

উত্তরমালা ঃ ইউনিট-৮

পাঠোত্তর মুল্যায়ন -১	ঃ	১) গ	২)ক	
পাঠোত্তর মুল্যায়ন -২	ঃ	১) খ	২) খ	৩)খ
পাঠোত্তর মুল্যায়ন -৪	ঃ	১) খ	২) খ	
পাঠোত্তর মুল্যায়ন -৫	ঃ	১) গ	২) গ	
পাঠোত্তর মুল্যায়ন -৬	ঃ	১) গ	২) খ	
পাঠোত্তর মুল্যায়ন -৭	ঃ	১) ঘ	২) খ	
পাঠোত্তর মুল্যায়ন -৮	ঃ	১) ক	২) গ	
পাঠোত্তর মুল্যায়ন -৯	ঃ	১) ঘ	২) ঘ	
পাঠোত্তর মুল্যায়ন -১০	ঃ	১) ঘ	২) গ	